নির্বাচিত ও পরিমার্জিত প্রবন্ধ সংকলন

শ্বেতসন্ত্রাসের এইসময়



সাঈদ মুহাম্মাদ আবরার

CamScanner

প্রকাশকের কথা

'কেউ মনে না রাখার দেশ পূর্ব তুর্কিস্তান। মরিয়ম, মেহেরগুলেরা যেখানে হামেশা তড়পায়, সম্ভ্রম বাঁচাতে পাঁচতলার খোলা কার্নিশ থেকে লাফিয়ে জীবন বাঁচায় যে দেশের তরুণীরা, 'মেকিং ফ্যামিলি' নামের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের বিছানায় যেতে বাধ্য করা হয় যে দেশের নারীদের, তাঁরা উইঘুর। কাশগড় বা উরুমতুশি নামের দেশের, পূর্ব তুর্কিস্তানের বাসিন্দা। তাঁরা এই উম্মাহরই অংশ। জ্বলে পুড়ে নিপীড়নে খাক হওয়া এই ব্যথাতুর সময়ে আমাদের পৌরষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন রেখে যাওয়া মানুষ।'

মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ক্রুসেডের এই দিনে যুদ্ধ-অমানবিকতা আর প্রতিরোধের হালহকিকত নিয়ে গ্রাফিটির প্রথম প্রকাশনা 'শ্বেত সন্ত্রাসের এই সময়'। বাঁচতে হলে জানতে হবে, জানতে হলে পড়তে হবে।

CamScanner

শ্বেত সন্ত্রাসের এই সময়

(নির্বাচিত ও পরিমার্জিত প্রবন্ধ সংকলন)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নির্বাচিত ও পরিমার্জিত প্রবন্ধ সংকলন

শ্বেত সন্ত্রাসের এই সময়

সাঈদ মুহাম্মাদ আবরার

যুদ্ধ ও রাজনীতি বিষয়ক বিশ্লেষক

মুদ্রার অপর পিঠ

CamScanner

শ্বেত সন্ত্রাসের এই সময়

সাঈদ মুহাম্মাদ আবরার

প্রকাশক	: *গ্রাফিটি* ২০১৯
প্রথম প্রকাশ	: নভেম্বর, ২০১৯
সত্ব	: সংরক্ষিত ©
প্রচ্ছদ	: লেখক
পরিবেশক	: **উদ্দীপন প্রকাশন, দোকান নং: ১২৫** ৩৮/৩ নিচতলা **বাংলাবাজার,ঢাকা-১১০০/ ০১৯৭৪৪-১১১৭২** fb.com/uddipanprokashon uddiponprkashon@gmail.com
অনলাইন পরিবেশক	: রুহামা শপ, রকমারি.কম, বইবাজার.কম বইগৃহ সিজদাহ.কম, ওয়াফিলাইফ.কম, খিদমাহ শপ
মূল্য	: ২৩০ (দুই শত ত্রিশ) টাকা মাত্র।



সাদাউল্লাহ ওয়াজির (১৯৯৫-২০১৩, উত্তর ওয়াজিরিস্তান)
মৃত্যুর কারণ : ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলা।
ফটো : মাসিমো বৈরুতি, ফরেন পলিসি ম্যাগাজিন।

যুগের হুবাল আমেরিকার ড্রোন-সন্ত্রাসের শিকার, পৃথিবীব্যাপী নিপীড়িত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মজলুম মানুষের প্রতি-হৃদয়ের আকুতিসহ...

CamScanner

এই বইয়ে সংকলিত কলামগুলোর রচনাকাল ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল। *আয়লান কুর্দি* শিরোনামের নিবন্ধটি সিরিয়া বিষয়ক বইয়ের অংশবিশেষ। কাশগড় বা পূর্ব তুর্কিস্তান নিয়ে একটি লেখা ছিল ২০১০ সালের। কিন্তু সেটি পাওয়া না যাওয়ায় নতুন করে এ বিষয়ে একটি আর্টিকেল যোগ করা হয়েছে। এছাড়া লিবিয়ার সর্বসাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে অন্য একটি আর্টিকেলও নতুনভাবে লেখা হয়েছে। অন্য কলামগুলো বিভিন্ন সময় সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কয়েকটি কথা

আপনি একটি কথা খুব শুনে থাকবেন, 'বর্বরেরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে!' এসময়ের পৃথিবীতে এ আলাপ খুব অপরিচিত নয়। 'চরমপন্থা' ও 'মৌলবাদ' বিশ্বকে কতটুকু অনিরাপদ করে তুলছে, সিএনএন-বিবিসির ভাষ্য ছাড়িয়ে এ বয়ান এখন শোনা যায় মহল্লার গলি-ঘুপছি কিংবা পাড়ার টঙদোকানে। সবজান্তার বেশধারীরা এসব আলাপ হাজির করেন অনায়াসে। গাঁও-গেরামের মসজিদ-মিম্বর থেকেও ভেসে আসে পশ্চিমা ভার্সনের সহনশীলতার স্বর-সুর। এসময় আমরা দেখছি বহুরূপী ইসলামপন্থা। সহিষ্ণুতা ও চরমপন্থা নিয়ে নানা শরাহ-সংজ্ঞা প্রচার-প্রকাশ করছেন ইসলামের ভেতরের ও বাইরের লোকজন। নাস্তিক-মুরতাদ ও ইসলামের চিহ্নিত দুশমনের মুখেও হরহামেশা শোনা যায়, মুসলমানদের কী করা উচিত, উচিত না -এ জিগির। নসিহত খয়রাত করেন তাবলিগে 'তিনদিন সময় লাগানো' শ্রুশ্রূহীন নয়ামুসল্লি, 'মকসুদুল মু'মেনীন'জাতীয় 'ধর্মীয় পুস্তক' বা বুখারি শরিফের তরজমা পড়ুয়া ধর্মজ্ঞ, টিভি-অনলাইন শায়েখের লেকচার শোনা প্রায় ধার্মিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিস বা মাদরাসা পড়ুয়া হলে তো কথাই নেই। ইসলাম, ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ-বিতরণ এসময় খুবই সস্তা! 'সিআইএ' সব দেখতে আছে' মতের প্রবক্তারাও উম্মাহর শ্রেষ্ঠসন্তানদের নসিহত খয়রাতে দ্বিধা করে না। মুদ্রার এই পিঠটি আসলে অনেক বেশি জঘন্য।

...

আজকের পৃথিবীতে পশ্চিমারা খোলাখুলি ইসলামের উপর আক্রমণ করছে। তাদের সমরশক্তির একমাত্র লক্ষ্যবস্তু মুসলিম উম্মাহ।

CamScanner

সমান্তরালে চলছে বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ। মনস্তাত্ত্বিক এই যুদ্ধে পশ্চিমা থিঙ্কট্যাঙ্কের পাশে যুক্ত হয়েছে ইসলামের আলখেল্লাধারী মডারেটরা। আগাগোড়া পশ্চিমি জীবনধারায় অভ্যস্ত এসব 'শায়েখ' চাতুর্যপূর্ণ লেকচার ও প্রচার-পুস্তিকায় তরুণ প্রজন্মকে ভালোই দ্বিধাগ্রস্ত করছে। 'ফিকহুল আলাবিয়াত' –উম্মাহর কল্যাণে কোন বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেতে পারে- এ বিষয়ে খুব বেশি মানুষের ধারণা না থাকায় তাদের কাজটি আরো সহজ হয়ে গেছে। দ্বীনের হুদুদ, হুকুম ও আহকাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কর্তৃক সুনির্ধারিত হওয়ার পরও বেশিরভাগ মানুষ এ বিষয়ে বেপরোয়া। এদেশীয় গণ্ডিতে বাংলা ভাষার চর্চা কিংবা ইবনে খালদুন-বুতি পড়িয়ে উম্মাহর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার চেষ্টার রসিকতাও দেখা যায়। এ ঘরানার কারো আছে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট, কারো বেতারের ইন্টারনেন্ট। সংস্কৃতিমনা হওয়া বা পহেলা বৈশাখ 'শুরু করি পুণ্যময় কর্মে' টি-শার্ট গায়ে ইসলাম উদ্ধারের এই চেষ্টাগুলো চোখ জ্বালা করে। বৈশাখী পান্তা-ইলিশের নতুন ভার্সন 'গরুর মাংশ গরম ভাত' মূর্খতারই পরিচয়বাহী। অভিজাত রেস্তোরা, দামি হল ভাড়া করে গোলটেবিল-সেমিনারে পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেকচারের দিনশেষে তৃপ্তির ঢেকুর তোলা বক্তার কাছে এসময়ের প্রতিরোধের গল্পগুলো তাই অবাস্তব, অসম্ভব ও অসহ্যকর! শত্রুসমীপে শান্তির বার্তাবাহী এসব নির্বোধ আগ্রাসন প্রতিহতকারীদের প্রতিই উল্টো আঙুল তুলছে।

...

কাব্যিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তি তাড়িত এসময়ের তারুণ্যের মাঝে বহুবিধ অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তরুণ বক্তা, তরুণ গবেষক, তরুণ লিখিয়েরা ইসলামপন্থার যেসব রূপরেখা হাজিরে কোশেশ করছেন, তা নিয়ে ভাবিত হওয়ারও সবিশেষ গরজ রয়েছে। আমি বিভিন্ন সময় পরিচিত মহলে বলে এসেছি, এদেশে দেওবন্দিয়ত নষ্ট হয়ে গেছে। এখন থেকে এক দশক আগের শঙ্কাগুলো এখন বাস্তবতা। কাফেরদের আয়নায় নিজেকে দেখা, কাফেরদের চোখে 'গুড মুসলিম' হওয়ার উদগ্র বাসনা আমাদের তরুণদের যেন চেপে

ধরেছে। 'আত্মপ্রতিষ্ঠা' বা অন্যের চোখে 'সামাজিক' হওয়ার নানান রূপ ও প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত ছোট করে নিয়ে আসছে দ্বীনের গণ্ডি, কর্তিত হচ্ছে ফরজ-ওয়াজিব। বিসর্জিত হচ্ছে প্রিয় নবীর প্রিয় সুন্নাহ! দ্বীন কায়েমের পথ ও পন্থা নিয়ে তো এন্তার বিতর্ক। খোদ পিতৃপরিচয়ের দিকেও আঙুল তুলছে এসময়ের তারুণ্য। 'উসূলে হাশতেগানাহ'র* খোলনলচে তাই পাল্টে গেছে সময়ের সঙ্গে। কাব্যচর্চা, পুস্তক অনুবাদ, ওয়াজ-নসিহত, বড়োজোর গণতন্ত্রের শক্তপোক্ত কর্মী- এই যেন দেওবন্দিয়ত! আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত বন্দীর কাফনের কাপড়ে কয়লার কালিতে লেখা 'আস-সাওরাতুল হিন্দিয়্যা'* –হিন্দের আজাদি তাই অধরাই থেকে গেছে আরো প্রায় দুটি শতক। প্রতিনিয়ত বাড়ছে এ অঙ্গনের অস্থিরতা। শাহবাগী আল্লামা থেকে তাবলিগ জামাত, শোকরানা থেকে চরমোনাই, ফেতনা ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে ঘরে। ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবীই যেন হাদিসে ঘোষিত নির্দিষ্ট দুটি তাঁবুতে বিভক্ত হয়ে পড়ছে- একটি তাঁবু ইসলামপছন্দ শক্তির, অন্য তাঁবুটি নেফাকের। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেখানে ঈমানের ছিটেফোঁটাও থাকবে না। ভাগাভাগির এই দিকটি আপনার দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ নাও হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা তাতে বদলাবে না। ইসলাম বা কুফর, আলো বা অন্ধকার- এর যেকোনো একটি আপনাকে অবশ্যই বেছে নিতে হবে। কারণ, এ'দুয়ের মাঝখানে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই। মুমিনের জন্য এতোটুকুও নেই। আলো-আঁধারির গোলকধাঁধায় ইবনে উবাইর সন্তানরাই কেবল ঘুরপাক খায়, খেতে পারে, মুমিনেরা নয়। মুমিনের জীবন তথাকথিত দোয়েল-ফড়িংয়ের জীবনও নয়। মুমিনেরা যাপন করেন মানুষের জীবন। যে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা, আশরাফুল মাখলুকাত। যে মানুষের জন্য রয়েছে জান্নাতের উত্তরাধিকার।

...

আজ বিশ্বব্যাপী হক ও বাতিলের মধ্যে একটি লড়াই চলছে। এ যুদ্ধ চলছে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে। এখানে আপনাকে একটি পক্ষ অবশ্যই বাছাই করতে হবে। আপনি চাইলেও মাঝামাঝি

CamScanner

অবস্থান করতে পারবেন না। এখানে, এই সময়ে, নিরপেক্ষ-ছাপোষা থাকবার কোনো সুযোগই নেই। আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনি হিজবুর রহমানের সঙ্গে থাকতে চান, না হিজবুশ শয়তানের সঙ্গে? এ দুটি ছাড়া তৃতীয় কোনো অবস্থান নেই। পৃথিবী দ্রুত একটি সিদ্ধান্তমূলক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভূ-রাজনীতি, খরা-দারিদ্র্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিক পট-পরিবর্তন, সর্বোপরি হাদিসে ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘটনাগুলোর সংঘটন পরম্পরা- এই সত্যকে প্রকট করে তুলে ধরছে। ধোঁয়াশা কেটে দিনকে দিন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি চূড়ান্ত সংঘাত অন্যকথায় উম্মাহর দ্বিতীয় স্বর্ণযুগের দিকে। রক্তে ধুয়ে মিলবে চূড়ান্ত এই মুক্তি!

এখন থেকে এক বা দুই দশক আগের পরিস্থিতির চেয়ে আজকের দিনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমানে যে যুদ্ধ আবহ বিরাজ করছে, দশ বছর আগে এর আভাস-ইঙ্গিতটুকুও ছিল না। আরো দশ বছর আগে তাও না। হাল আমলের তারুণ্য এ-বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও সত্তুর বা আশির দশকে বেড়ে উঠা প্রজন্মের কাছে আজকের দিনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাও প্রয়োজনীয় নয়। তাঁরা জানেন, কত দ্রুত আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মালহামা ও মাহদির আগমনের দিকে।

...

এই বইয়ে ফেতনা বা আখেরুজ্জামান আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। বরং দেশে দেশে মুসলিম নিপীড়ন আর সেই নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেগে উঠা উম্মাহর শ্রেষ্ঠসন্তানদের সর্বাত্মক-প্রতিরোধ, জিহাদ-সংগ্রামের সামান্যটুকু আলোকপাত করা হয়েছে এখানে। বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর জন্য লেখা আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর কয়েকটির সংকলন এই গ্রন্থ। বহু আগেই এটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বিবিধ কারণে তা বাধাগ্রস্ত হয়। শুরুতে চারশ পৃষ্ঠার মতো হলেও শেষপর্যন্ত ১৭৬ পৃষ্ঠায় এর কলেবর সীমাবদ্ধ রাখা গেল। পুরাতন মনে হলেও আশা করি, এর

পাঠ আপনাকে খানিকটা আন্দোলিত করবে। কখনো অশ্রু ঝরাবে, কখনো ফোঁটাবে হাসি। হয়তো চিন্তার ভাঁজও ফেলবে কপালে। মুষ্ঠিবদ্ধ হবে হাত। যাই হোক, ভালো লাগুক এর পাঠ-পঠন, সার্থক হোক বই আকারে মুদ্রিত এর সংস্করণ। উম্মাহর জন্য কিছুটা ব্যথা, দরদ ও সহানুভূতি যদি জাগে কারো মনে, হয়তো সফল হবে এই মুদ্রণচেষ্টা। আল্লাহ কবুল করুন। বিপন্ন এই সময়ে দোয়ায় যেন ভুলবেন না।

اللهُمَّ أَرِنَا الحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا البَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

– গুনাহগার
সাঈদ মুহাম্মাদ আবরার
পুরানা পল্টন, ঢাকা।

পুনশ্চ :

–উসূলে হাশতেগানাহ : মাওলানা কাসেম নানুতুবী রাহিমাহুল্লাহ পরাধীন ভারতে বিলুপ্ত দ্বীনী শিক্ষার পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে *দারুল উলূম দেওবন্দের* ভিত্তি স্থাপন করেন। সময় ও অবস্থার বিচারে এই ইলমি মারকাজ যাতে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত না হয়, সেজন্য তিনি কিছু মূলনীতি প্রবর্তন করেন। এগুলোকে একত্রে 'উসূলে হাশতেগানাহ' বা 'মূলনীতি অষ্টক' বলা হয়।

–আস-সাওরাতুল হিন্দিয়্যা : ভারতের অযোধ্যা নগরীর খায়রাবাদে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী রাহিমাহুল্লাহ ১৭৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। একজন মওলানা হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। ১৮৫৭ সালের আজাদি আন্দোলনের এই মহানায়ককে ক্রুসেডার বৃটিশ আদালত দোষী সাব্যস্ত করে। তাঁর সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে আন্দামানের কুখ্যাত কালাপানির জেলে নির্বাসন দেওয়া হয়। বন্দী অবস্থায় এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। মওলানা তাঁর মনের অন্তিম কথাগুলো আরবি ভাষায় কাফনের কাপড় ও টুকরো কাগজে কয়লা ও পেন্সিলের সাহায্যে

লিখেছিলেন। নির্বাসিত জীবনে মওলানা 'আস-সাওরাতুল হিন্দিয়্যা' ছাড়াও 'কাসিদাতু ফিতনাতিল হিন্দ' নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

'আস-সাওরাতুল হিন্দিয়্যা- হিন্দের বিপ্লব' বইয়ে তিনি উপমহাদেশের আজাদি আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং আন্দামানে তাঁর উপর নির্যাতনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পুস্তকটি তাঁর ছেলে আব্দুল হক খায়রাবাদীর মাধ্যমে উলামায়ে দেওবন্দের হাতে পৌছালে তাঁরা এর পাণ্ডুলিপিটি হাতে লিখে প্রচার করেন। ১৯৪১ সালে মওলানা আবদুস শাহেদ খান শিরওয়ানী 'আস-সাওরাতুল হিন্দিয়্যা' উর্দুতে অনুবাদ করেন এবং বিজনূরের বিখ্যাত উর্দু অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা 'মদিনা'র প্রকাশক মৌলবি মজিদ হোসাইন মূল আরবিসহ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। সেসময় ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতার একেবারে শেষমুহূর্ত হলেও এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেনিয়া সরকার একে নিষিদ্ধ ও এর অনুবাদক-প্রকাশককে চরম নির্যাতন করে।

বই নিয়ে দুটি কথা

শ্বেত সন্ত্রাসের (*White Aggression*) প্রায় শত বছর হতে চলেছে। খেলাফত পতনের পর থেকে মুসলিম কোনো ভূখণ্ড নিরাপদে নেই। মরক্কো থেকে ফিলিপিন, কোথাও মুসলিমেরা শান্তিতে নেই। পশ্চিমা সন্ত্রাসীদের নির্যাতন-নিপীড়ন এখন সর্বোচ্চ চূড়ায় এসে উপনীত হয়েছে। এই একবিংশ শতাব্দীতে 'ওয়ার অন টেরর'- নামে কুফফার শক্তি চূড়ান্ত ক্রুসেডের ডাক দিয়েছে। আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, ইয়েমেন, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, মিসর, আলজেরিয়া, কাশ্মির, ফিলিস্তিন, সিরিয়া -সর্বত্র আগুন জ্বলছে। পূর্বের তরবারি ও ঢালের স্থান নিয়েছে ক্লাশিনকোভ, ফাইটার প্লেন, ট্যাঙ্ক, ড্রোন। কিন্তু আরো মারাত্মক কিছু যুক্ত হয়েছে এখন। যুদ্ধ শুধু ময়দানে সীমাবদ্ধ নেই। তা ময়দান থেকে এখন প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। একে বলে, *সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার* বা 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ'। যোগ হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কটের হাতিয়ারও। এছাড়া পশ্চিমের পক্ষে আছে আলখেল্লাধারী মোনাফেকরাও। শেষ বারো বছরে আমরা অনেক নতুন কিছু অবলোকন করেছি। আরব বসন্ত, আফগানিস্তানে আমেরিকার পরাজয়, ওসামা বিন লাদেনের হত্যা, সিরিয়ায় মহাযুদ্ধের পদধ্বনি, গাদ্দাফি, সাদ্দাম, হোসেনি মোবারকের পতন, মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা। দেখেছি সিরিয়ার শরণার্থী, আয়লান কুর্দি ও বাকসোবন্দী মানবতার দৃশ্য, দেখেছি গণবিপ্লব ও তথাকথিত গণতন্ত্রের উত্থান, দেখেছি বস্তুবাদের কাছে মানবতার মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা, দেখেছি ভারতে হিন্দুত্ববাদের উত্থান ও মিসরে নবনির্বাচিত মুরসির পতন। দেখেছি সিরিয়া হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আফগানিস্তান, আর গাজায় দখলদারির

দেয়াল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, এই সময় পতনের নয়, এটি উত্থানের সময়। নিপীড়িত মুসলিমেরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রস্তুতি নিচ্ছে মহাযুদ্ধের কালের। আমেরিকার সিক্রেট মিশন ব্যর্থ হচ্ছে। পশ্চিমা সভ্যতার আর্তনাদ আকাশে-বাতাসে গুঞ্জরিত হচ্ছে। আর বেশি দিন নেই। বেশি দেরি নেই। ইনশাআল্লাহ, আমরা এই জায়ান্ট সিভিলাইজেশনকে (দানবীয় সভ্যতা) ধ্বংস হতে দেখতে পাবো। চূড়ান্ত বিজয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

আমার দ্বীনী ভাই ও বন্ধু *সাঈদ মুহাম্মাদ আবরার* আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও রাজনীতি বিষয়ক বিশ্লেষক। এই সময়ের শ্বেত সন্ত্রাসের আলাপচারিতা তিনি তাঁর কলমে তুলে ধরেছেন। ইসলামি আদর্শের চেতনা ধারণ করে লিখেছেন নিপীড়ন ও প্রতিরোধ, আঘাত ও প্রত্যাঘাতের গল্পগুলো। প্রতিটি লেখা ও বাস্তবতার আলোকে ঘুমন্ত জাতির সুপ্ত চেতনাকে তিনি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। 'শ্বেত সন্ত্রাসের এই সময়' গ্রন্থটি তাঁর নির্বাচিত ও পরিমার্জিত কিছু প্রবন্ধের সংকলন। বইটির আদ্যপ্রান্ত পড়ার এবং কিছু সম্পাদনা করার সুযোগ হয়েছে আমার। আশা করি, পাঠক এই বইটি সানন্দে গ্রহণ করবেন। আল্লাহ গ্রন্থটিকে কবুল করুন। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদেরকেও দান করুন জাযায়ে খায়ের। নিশ্চয় তিনি উত্তম পুরস্কারদাতা আর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন।

- কায়সার আহমাদ

অক্টোবর ২০১৯, ঢাকা।

সূচিপত্র

পায়ে হেঁটে এসেছি হেঁটেই ফিরে যাব ২১

কান্দাহারের দিনরাত্রি ৩১

ইতিহাসের গোরেস্তানে ৩৫

ভারতে মুসলমান হওয়ার অর্থ কী? ৩৯

পূর্ব তুর্কিস্তান; উম্মাহর ভুলে যাওয়া ক্ষত ৪৭

সৈন্যরা পরাজিত হয় চেতনা পরাজিত হয় না ৫৭

সব হারানোর বেদনা ৬১

'যে জলে আগুন জ্বলে' ৬৫

গণবিপ্লব ও গণতন্ত্রের কাকতাড়ুয়া ৭১

পশ্চিমাদের যুদ্ধ-খেলা ও গাদ্দাফির নির্মমতা ৭৫

সিরিয়া মধ্যপ্রাচ্যের আফগানিস্তান ৭৯

কী দিয়েছে বসন্ত-বিপ্লব? ৮৫

লিবিয়া; মহাসমরের নতুন ফ্রন্ট ৯৫

কাঠে খোদাই বর্ণমালা ১০১

হর্ন অব আফ্রিকার দুঃসময় ১০৭

আবাবিলের নিশানা! ১১৩

আয়লান কুর্দি ও বাকসোবন্দী মানবতার গল্প ১১৭

গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের কৌতুক ১২৩

সিক্রেট আমেরিকার গোপন মিশন ১২৭

নষ্ট সভ্যতার আর্তনাদ ১৩৯

CamScanner

'ইসলাম অথবা ফ্রান্স' ১৪৭
নিপীড়িত উম্মাহ একদিন জাগবে ১৫৫
প্রোপাগান্ডা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের এই সময় ১৬৫
দখলদারির দেয়াল ১৬৯
মানবিক হস্তক্ষেপের ছলাকলা ১৭৩

“

এখন শীত।
পাহাড়ের শাদা চূড়ায় বরফের শাদা সিংহ,
উত্তরে হিমেল হাওয়া।
সূর্য ডোবার পর প্রতিদিন,
মধ্যরাতে উঠে ভূ-কম্পন,
রাইফেল-কার্তুজ তোলে গর্জন।
রাইফেল আজ খরগোশ শিকার করছে না,
কার্তুজ খোঁজে শুধু 'শাদা' মানুষ।
– আফগান কবি শেরগুল খান

”

পায়ে হেঁটে এসেছি হেঁটেই ফিরে যাব

(প্রসঙ্গ : *আফগানিস্তান*)

মোহসেন মাখমালবাফ (জন্ম : মে ২৯, ১৯৫৭, তেহরান)। আফগান অন্তঃপ্রাণ এই ব্যক্তি দেশটিকে উপজীব্য করে *দ্য সাইক্লিস্ট* ও *কান্দাহার* নামে দুটি মুভি নির্মাণ করেছেন। এই নিবন্ধে *তালেবান* আমলে তাঁর আফগান সফরের কিছু টুকরা-টাকরা ছবি ফুটে উঠেছে। লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়তে আপনার বেশকিছু সময় লাগতে পারে। নিবন্ধটি পড়তে যতোটুকু সময় লাগবে, এই সময়ে আফগানিস্তানে ক্ষুধা আর যুদ্ধে মারা যাবে ১৪জন, ৬০জন হবে উদ্বাস্তু। এ বিপর্যয়, মৃত্যু ও ক্ষুধার কারণ অনুসন্ধান করা হবে এ নিবন্ধে। কিন্তু তিক্ত এ প্রসঙ্গটি আপনার ব্যক্তিজীবনে কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে না পারলে, লেখাটি ভুলে যাওয়ার অনুরোধ থাকবে।

আফগানিস্তান সম্পর্কে বিশ্ব সম্প্রদায়ের ধারণা

দুই হাজার সালে *দক্ষিণ কোরিয়া পুসান চলচ্চিত্র* উৎসবে যোগ দিয়েছিলাম। আমাকে পরবর্তী চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু জিজ্ঞেস করা হলে বললাম, *আফগানিস্তান*। কিছুক্ষণের মধ্যে পাল্টা প্রশ্ন, আফগানিস্তান জিনিসটা কি? বিষয়টি কেমন হবে? একটি দেশ কতটা বাতিলের খাতায় নাম লেখালে এমনটি হতে পারে- এশিয়ারই অন্য একটি দেশ দক্ষিণ কোরিয়া তার নামও শুনবে না? কারণটি আসলে সবার জানা। আজকের বস্তুবাদী পৃথিবীতে আফগানিস্তানের কোনো ইতিবাচক ভূমিকা নেই। বিশেষ কোনো পণ্য তৈরির কৃতিত্ব কিংবা বিজ্ঞানের কোনো অগ্রগতি অথবা শৈল্পিকসম্মানের জন্য আফগানিস্তানের নাম কেউ কখনো শোনেনি। যারা আফগানিস্তান নামের সঙ্গে পরিচিত, তারা এই

দেশটিকে মাদক-চোরাচালান, জঙ্গিবাদ, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ও অন্তহীন গৃহযুদ্ধের নামান্তর মনে করেন। এ দেশের কোথাও শান্তি, স্থিতিশীলতা অথবা উন্নয়নের ছিটেফোঁটা নেই। এ কারণে কোনো পর্যটক দেশটি ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে না। কোনো ব্যবসায়ী এখানে অর্থ খাটিয়ে লাভের চিন্তা করে না। তাই এ দেশ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে না তো কি? এ দুর্নাম এতোদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে, হয়তো শিগগিরই অভিধানে লেখা হবে, আফগানিস্তান মানে মাদক উৎপাদনের দেশ- যার জনগণ বদমাশ, মারমুখী ও 'জঙ্গি'। এরা মেয়েদের পর্দায় মুড়ে ঘরের ভেতর আটকে রাখে!

এবার এ চিত্রটির সঙ্গে যোগ করুন বামিয়ানে বিশ্বের সবচে বড়ো বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের ঘটনাটি। এটি সারা বিশ্বে সমালোচনার ঝড় তুলেছিল এবং মূর্তি-শিল্প-সংস্কৃতি প্রেমিকরা আক্রান্ত মূর্তি রক্ষায় একাট্টা হয়েছিল। ভালো কথা! কিন্তু জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার জাপানি নাগরিক *সাদাকো ওগাতা* যখন সন্তাপ করে বলেন, 'ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে আফগানিস্তানে ১০ লাখ লোক মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে'- তখন কারো মনে সহানুভূতির উদ্রেক হয় না! কেন? কেন কেউ এর কারণ অনুসন্ধান করে না? কেন ক্ষুধার্ত আফগানিদের মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করতে কেউ এগিয়ে আসে না? যে দেশের মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে, সে দেশে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের বিষয়টি সবচে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় কোন যুক্তিতে? মূর্তির জন্য কাঁদল, মানুষের জন্য কাঁদতে পারল না কেন? আজকের 'সভ্য' ও 'উন্নত' পৃথিবীতে কি তাহলে রক্ত-মাংসের মানুষের চেয়ে পাথুরে মূর্তি বেশি মূল্যবান?

বাকি বিশ্ব যে চোখে দেখে, আমার চোখে কিন্তু তারচে আফগানিস্তান ভিন্ন একটি দেশ। সেখানে অন্যরকম আর ট্র্যাজিক এক চিত্র-অবয়ব ফুটে উঠে। সেই চিত্রে আফগানিস্তানের জনগণ ইতিবাচক ও শান্তিপ্রিয় মানুষ হিসেবে উঠে আসে। এ চিত্র অবহেলার বদলে দাবি করে সহানুভূতির। দুর্ভাগ্যবশত শেখ সাদির এ পংক্তি : *সব মানুষ একই শরীরেরই অঙ্গ*- জাতিসংঘের চটকদার স্লোগানই থেকে গেছে। বাস্তবতার মুখ দেখেনি।

পরিসংখ্যানে আফগান ট্র্যাজেডি

সোভিয়েত দখলদারিত্ব থেকে শুরু করে গত ২০ বছরে (২০০১ সাল পর্যন্ত) ২৫ লাখ আফগান নিহত হয়েছে। এসব মৃত্যুর কারণ বিদেশি দখলদারের হামলা, দুর্ভিক্ষ ও চিকিৎসাহীনতা। অন্যকথায়, সোভিয়েত আগ্রাসনের পর থেকে এপর্যন্ত প্রতিবছর সোয়া লাখ কিংবা প্রতিদিন ৩৪২জন কিংবা প্রতি ঘণ্টায় ১৪জন কিংবা প্রতি ৫ মিনিটে একজন করে মানুষ নিহত হচ্ছে। দুর্ঘটনা কবলিত রুশ ডুবোজাহাজে[১] ক্রুদের মৃত্যু ও দুর্দশার প্রতিমুহূর্তের খবর প্রচার করেছে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো। বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের খবরও অবিরত প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু ২০ বছরে প্রতি ৫ মিনিটে একজন আফগানের ট্র্যাজিক মৃত্যুর কথা কেউ বলেনি, কেউ বলে না। কেন?

আফগানিস্তান প্রবেশ করে দোঘারুন শুল্কদপ্তর পেরুতেই দেখলাম সাইনবোর্ডে লেখা অদ্ভুত কথা। পড়ে থাকতে দেখা যেকোনো বস্তুর ব্যাপারে দর্শনার্থীদের সতর্ক করা হয়েছে। ওগুলো আর কিছুই না, 'মাইন'। সাইনবোর্ডে লেখা আছে, 'আফগানিস্তানে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় সাতজন করে লোক মাইনের উপর পাড়া দিচ্ছে। সাবধান, আজ বা কাল আপনি তাদের একজন হয়ে না যান!'

আমি দেখেছি, হেরাত শহরে ২০ হাজার নারী-পুরুষ ও শিশু অভুক্ত অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুণছে। ওদের হাঁটার শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গেছে। খোলা আকাশের নিচে বিক্ষিপ্তভাবে ওরা চূড়ান্ত নিয়তির প্রতীক্ষা করছে। দুর্ভিক্ষের কারণে এই অবস্থা। একই দিন *সাদাকো ওগাতা* সে এলাকা ঘুরে গেছেন এবং মাদাম ওগাতা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন, 'বিশ্ব তাদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে।'

---

১ ২০০০ সালের ১২ আগস্ট মহড়াকালে টর্পেডো বিস্ফোরণে *কে-১৪১ কুরস্ক* (*K-141 Kursk*) নামে রুশ নৌবাহিনীর একটি পারমাণবিক সাবমেরিন এর সব আরোহীসহ ব্যারেন্টস সাগরের ১০০ মিটার গভীরে ডুবে যায়। উচ্চতায় প্রায় চারতলা সমান ক্রুজ মিসাইলবাহী এই ডুবোজাহাজে ক্রু ছিল ১১৮জন। দুর্ঘটনার অষ্টম দিন 'নরম্যান্ড পাইয়োনিয়ার' রেসকিউ-সাবমেরিন নিয়ে উদ্ধারকারীরা কুরস্কের মূল অংশে পৌছায়। ১৪ মাস পর ৭ অক্টোবর, ২০০১ সালে হল্যান্ডের উদ্ধারযান দিয়ে একে ভূমিতে তুলে আনা হয়।

তিন মাস ইরানি রেডিওতে শুনলাম, মাদাম ওগাতা বলেই যাচ্ছেন, 'আফগানিস্তান জুড়ে ক্ষুধায় ১০ লাখ মানুষ মৃত্যুর মুখে।'

এসব দেখেশুনে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, বুদ্ধের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়নি, বুদ্ধ বরং নিজেই লজ্জায় ভেঙে পড়েছেন। সে লজ্জা আফগানিস্তানের প্রতি বিশ্ববাসীর অবজ্ঞা দেখে। নিজের বিশালত্বের মহিমা দিয়ে কিছু করা যাবে না বুঝতে পেরে ভেঙে পড়েছেন বুদ্ধ। তাজাকিস্তানের রাজধানী দুশানবেতে দেখলাম, এক লাখ আফগান শরণার্থী খালি পায়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছুটছে। মনে হচ্ছিল, কেয়ামতের দৃশ্য দেখছি। বিশ্বের কোনো মিডিয়ায় এসব দৃশ্য দেখানো হয়নি। যুদ্ধকবলিত, ক্ষুধার্ত শিশুরা ছুটে বেড়াচ্ছে মাইলের পর মাইল। খালি পা। ওই পলায়নপর অসহায় লোকগুলোর উপর স্থানীয় গুন্ডারা হামলা করে। এই কঠিন সময়ে তাজিক সরকার এদের আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আশ্রয়ের অভাবে হাজার হাজার আফগান মরতে লাগল। আফগানিস্তান আর তাজিকিস্তানের 'নো-ম্যানস ল্যান্ডে' মরতে লাগল আশ্রয়হীন অসহায় নারী-পুরুষ। কেউ তাদের খোঁজ নেয়নি। বিখ্যাত তাজিক কবি গোলরোশকার লিখেছেন, 'আফগানিস্তানের মনে যতো দুঃখ, ততো দুঃখে অন্যকেউ যদি মরে, অবাক হওয়ার কিছু নেই।' সত্য কথা হলো, এতো দুঃখে আজ পর্যন্ত কেউ মরেনি।

চেহারাহীন দেশের ঐতিহাসিক চেহারা

আড়াইশ বছর আগে আফগানিস্তান ছিল ইরানের একটি প্রদেশ। নাদির শাহ'র আমলে এটি ছিল বৃহত্তর খোরাসানের অংশ। ভারত থেকে ফেরার পথে এক মাঝরাতে মেরে ফেলা হলো নাদির শাহকে। নাদির শাহ'র সেনাবাহিনীর আফগান অধিনায়ক আহমদ শাহ আবদালি চারহাজার সৈন্য নিয়ে পালিয়ে আসেন। ইরানের খানিকটা অংশ নিয়ে তিনি স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করেন, এভাবেই আজকের আফগানিস্তানের জন্ম।

সে আমলে আফগানিস্তানে মানুষ বলতে অধিকাংশই ছিল মেষপালক। ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল তারা। আহমদ শাহ আবদালি পশ্তুন গোষ্ঠীর লোক

ছিলেন বলে তাজিক, হাজারা, উজবেক প্রভৃতি গোষ্ঠী তাঁর কর্তৃত্ব পুরোপুরি মেনে নিল না। একারণে চুক্তি হলো, গোষ্ঠী শাসন করবে সে গোষ্ঠীর নেতা। এসব স্থানীয় নেতা মিলে গঠন করলেন একটি গোষ্ঠীগত ফেডারেশন। এর নাম রাখা হলো, 'লয়া জিরগা'। আফগানিস্তানে এরচে উপযুক্ত ও কার্যকর আর কোনো সরকারব্যবস্থা তৈরি করা যায়নি। এই *লয়া জিরগা* দেখলেই বোঝা যায়, আফগানিস্তানের মানুষ যে শুধু অর্থনৈতিকভাবে মেষপালনের অবস্থা থেকে খুব বেশি দূর এগোতে পারেনি তা নয়, গোষ্ঠীগত শাসন থেকেও একপা এগোতে পারেনি তারা। একারণে মাতৃভূমি ত্যাগ না করা পর্যন্ত একজন আফগান তার আফগানসত্ত্বা টের পায় না। কিন্তু আফগানিস্তানের ভেতরে তারা হয় পশ্তুন, হাজারা, উজবেক নয়তো তাজিক। আমি একবার দেখেছি, শুধু রুটির জন্য দাঁড়ানো লাইনে একজন আরেকজনকে টপকে যাওয়া নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সহিংস সংঘাত বেঁধে যায়।

তালেবান কারা?

সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন, একটি জাতি সরকারের কাছ থেকে প্রথমে যা চায় তাহল, নিরাপত্তা। এরপর তারা দাবি করে, কল্যাণ। তারপর চায়, উন্নয়ন ও মুক্তি। সোভিয়েত সৈন্যদের আফগানিস্তান ত্যাগের পর তুমুল গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ায় দেশজুড়ে নিরাপত্তাহীনতা তীব্র হয়ে উঠে। নিরন্তর লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের নিজেদের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা নিজেরাই করতে থাকে। এর ফলে কেউ গোটা দেশকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। নির্মম পরিহাস হলো, প্রত্যেকে দেশকে নিরাপত্তাহীনতার আঁধারে ঠেলে দিয়ে নিজের নিরাপত্তা বিধান করবার চেষ্টা করেছে।

ধর্মপ্রাণ তালেবান নিরস্ত্রীকরণের কৌশল নিয়ে এগিয়ে এলো। তাঁরা নিজেদেরকে শান্তির দূত হিসেবে প্রচার করল। খুব দ্রুত তাঁরা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। অন্যকোনো গোষ্ঠী আফগানিস্তানে শাসনভার কব্জা করতে ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ, যুদ্ধ ও নিরাপত্তাহীনতা ছাড়া তারা আর কিছু দিতে পারেনি। হেরাতের লোক কথা বলে ফারসি ভাষায়। তালেবানের ভাষা পশ্তু। হেরাতে

তালেবান সম্পর্কে জানতে চাইলাম। এক দোকানদার জানাল, 'তালেবান আসার আগে সশস্ত্র গুন্ডারা নিয়মিত তার দোকান লুট করতো। এখন আর তা হয় না।' এমনকি যারা তালেবানের বিরোধী তারাও স্বীকার করল, তালেবান যে নিরাপত্তা দিয়েছে, তাতে তারা নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারছে।

দুটি কারণে তালেবানের সময় নিরাপত্তা ফিরে এসেছে। প্রথম কারণটি হলো, আমজনতার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো, তালেবানের দেওয়া কঠোর শাস্তি (শরয়ী হদ)। এসব শাস্তি দ্রুত বাস্তবায়িত হয়। হেরাতে ২০ হাজার অভুক্ত আফগানির চোখের সামনে একখণ্ড রুটি ফেলে রাখা হলেও, কেউ তা কুড়িয়ে নেবে না। খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম, তালেবান আসার আগেই বরং এক গোষ্ঠীর লোক আরেক গোষ্ঠীর উপর হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটাত। নিরস্ত্রীকরণ ও কঠোর শাস্তি বিধান এসব সহিংসতা অনেকাংশে হ্রাস করেছে।

আফগানিস্তানের দুর্দশা দেখে কারো হৃদয় গলেনি। পাষাণ হয়ে থেকেছে। কিন্তু যে হৃদয়টি পাষাণ হতে পারেনি, সেটি বামিয়ান প্রদেশের সুবিশাল বুদ্ধমূর্তির হৃদয়। আফগান ট্র্যাজেডির করুণ দৃশ্য দেখে বিশালত্বের শত অহঙ্কার সত্ত্বেও বুদ্ধ অপমানবোধ করেছেন এবং ভেঙে পড়েছেন! এক টুকরো রুটির জন্য কাতরানো এক জাতির সামনে বুদ্ধ তার সৌম্যভাব টিকিয়ে রাখতে পারেননি। তিনি লজ্জায় নিজেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধ ধুলোয় মিশে বিশ্বকে জানাতে চেয়েছেন, আফগানিস্তানের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, নির্যাতন ও পিঁপড়ের মতো মানুষের মৃত্যুর কথা। কিন্তু বিশ্ববাসী শুধু বুদ্ধের ভেঙে পড়ার শব্দই শুনতে পেল! চীনা প্রবাদ আছে, 'আপনি আঙুল দিয়ে চাঁদ দেখাচ্ছেন, কিন্তু বোকা তাকিয়ে আছে আপনার আঙুলের দিকে।' কেউ বুদ্ধের আঙুলের ইশারা অনুসরণ করে বিপন্ন একটি দেশ দেখতে পেল না। যোগাযোগের বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল না করে আমরা কি কেবল যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকব? তালেবানের মৌলবাদ কি আফগানিস্তান নামের দেশটির ভয়ঙ্কর নিয়তির প্রতি বিশ্ববাসীর অবজ্ঞার চেয়েও জটিল?

আমজনতার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এবং শাস্তির বিধান করে তালেবান আফগানিস্তানে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছে। দিনে দু'ঘণ্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে *শরিয়ত রেডিও*। দেশের কোথাও যদি যুদ্ধ চলে, শুধু জনমনে নিরাপত্তার বোধ যাতে নষ্ট না হয়, এজন্য তারা তা প্রচার করে না। কিছু প্রচার করলেও তা করা হয় পরোক্ষভাবে। ধরা যাক, তারা বলল, তাখার প্রদেশের জনগণ তালেবানকে স্বাগত জানিয়েছে। আপনি ভালো করেই বুঝবেন, এর অর্থ- তালেবান তাখারে হামলা চালিয়ে তা দখল করে নিয়েছে। নিরস্ত্রীকরণ, শাস্তিবিধান এবং এ-জাতীয় প্রচারণা আফগানিস্তানে এমন এক নিরাপত্তাবোধ তৈরি করেছে, তালেবান আসার আগেকার নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে যা প্রকৃতই ভিন্ন।

আফগান সহিংসতা

ফ্রয়েডের মতে, 'মানুষের ভেতর লুকিয়ে থাকা পশুত্বই তার আগ্রাসী মনোভাবের উৎস। সভ্যতা ও পশুত্বের মাঝে পাতলা একটি আস্তরণ কাজ করে। যখনই সংঘাত কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোড়ন উঠে, ওই পাতলা পর্দা ছিঁড়ে যায়। বেরিয়ে আসে মানুষের পশুসত্ত্বা।' আমার বিশ্বাস, এমন কি অত্যন্ত অগ্রসর সভ্যতাগুলোর ভেতরেও মানুষের সহিংসতা কেবল তার পদ্ধতি বদল করেছে। সভ্যতার কারণে মানুষ অহিংস হয়ে যায়নি। তলোয়ারের কোপে মাথা কেটে ফেলা আর বুলেট, গ্রেনেড, মাইন ও মিসাইলের আঘাতে মানুষ মারার মধ্যে তফাৎটা কোথায়? আজকের পৃথিবীতে কেউ লাখ লাখ আফগানির মৃত্যুকে বিশ্বের অবিচার বলে আখ্যায়িত করে না। গৃহযুদ্ধ বা সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে আফগান জনসংখ্যার ১০ শতাংশের মৃত্যুকে কেউ আগ্রাসন বলে না। তরবারির কোপে কার শিরোচ্ছেদ ঘটানো হলো, সেটিই স্যাটেলাইট টিভির মূল শিরোনাম হয়ে দাঁড়ায়! তরবারির কোপে কারো শিরোচ্ছেদ দৃশ্য বীভৎস লাগে, কিন্তু ভূমিমাইনে গড়ে প্রতিদিন সাতজন মানুষের মৃত্যুর খবর কেন বীভৎস নয়? কেন মাইন বিস্ফোরণে মানুষ হত্যা তরবারি দ্বারা হত্যার সমান নয়?

আফগান আগ্রাসনের নামে আসলে যার সমালোচনা করা হচ্ছে, সেটি আগ্রাসনের তরিকা। আগ্রাসনের মর্মবস্তুর সমালোচনা হচ্ছে না। একটা পাথুরে

মূর্তির জন্য বিশ্ব শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়, কিন্তু লাখ লাখ লোকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তারা আশ্রয় নেয় পরিসংখ্যানের। স্তালিন যেমনটি বলেছিলেন, 'একজন মানুষের মৃত্যু ট্র্যাজেডি। কিন্তু লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু শুধুই পরিসংখ্যান'।

আফগানিস্তান যুদ্ধের নিয়তি

দোখারুন থেকে হেরাতে যাওয়ার সময় মনে হলো এক উন্মাতাল সাগর পাড়ি দিচ্ছি। মনে পড়ল, ক্যামেরায় দৃশ্যধারণ করতে গিয়ে পারস্য উপসাগরে ঝড়ের মুখে পড়ার স্মৃতি। ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকা কয়েক মিটার উঁচুতে লাফিয়ে উঠছে, তারপর আছড়ে পড়ছে পানিতে। মাঝি বলল, 'নৌকা উল্টে গেলে চিরবিদায়!'

এবার ঢেউ দেখলাম। ময়লার ঢেউ। শুরুতে আমাদের গাড়ি উতরাই বেয়ে নামলো। তারপর চড়াই বেয়ে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছাল। এবার গাড়ি ঠেলে এলো আবর্জনার ঢেউ। রাস্তার অবস্থা জঘন্য। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের মতো উঠে আসছে কোদাল হাতে মানুষের ঢল। যতোদূর চোখ যায়, শুধু কোদাল হাতে মানুষ দেখা যায়। আমাদের গাড়ি তাদের কাছাকাছি যেতেই দেখলাম, কোদাল দিয়ে তারা গর্তে ময়লা ফেলে তা ভরাট করছে।

হেরাতে পৌঁছে দেখি, রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মুমূর্ষু মানুষ। আমার কাছে এটি আর বিশেষ কোনো দৃশ্য বলে মনে হলো না। ইচ্ছে হলো, সিনেমা করা ছেড়ে দিয়ে অন্যকিছু করি। আফগানিস্তানের শীর্ষ সামরিক কর্তা মাসুদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'নিজের ছেলেকে কি বানাতে চায়?' জবাবে বলেছিলেন, 'রাজনীতিবিদ'। এর অর্থ, সমস্যা সমাধানের পথ হিসেবে যুদ্ধও অসার হয়ে পড়েছে এক সেনাঅধিনায়কের কাছে। তিনি ভাবছেন, আফগান সংকটের নিষ্পত্তি রাজনীতির পথে আসবে। আমার মতে, আফগান সংকটের একমাত্র সমাধান, নিজেদের সমস্যাগুলো গভীর ও প্রাজ্ঞ উপায়ে শনাক্ত করা। যে দেশ নিজের ও বিশ্বের কাছে এতোদিন চেহারাহীন থেকেছে, সে দেশের সঠিক চেহারা তুলে ধরা।

কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান!

নিজেদের অভ্যন্তরীণ বাজার ফুরিয়ে যাওয়ার পর শিল্পোন্নত দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে হাত বাড়িয়েছে। নিজেদের পণ্যভোগের দাম মেটাতে অশিল্পায়িত দেশগুলোও দু-একটা পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে ছাড়ছে। যারা তা পারেনি, তারা দিচ্ছে সস্তা শ্রম। এই দেওয়া-নেওয়ার খেলায় পার্বত্য ভূমি এবং রাস্তা-ঘাটের অভাবে আফগানিস্তান তার কাঁচামাল কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। উৎপাদন ও ভোগের এই বিশ্বব্যবস্থায় প্রবেশের ক্ষেত্রে হাতের কাছে সবচে সহজ সম্পদ কোনটি? আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে সেটি নিঃসন্দেহে 'সস্তা শ্রম।' রাস্তা-ঘাটহীন পার্বত্য আফগানিস্তানের কাঁচামালকে শিল্পোৎপাদনে ব্যবহার করার চেয়ে শ্রম একীভূত করা সহজ। আফগানিস্তানের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে সামরিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে। বিবেচনা করতে হবে অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনার কথা। যদি মেনে নেওয়া হয়, বর্তমান সংকটের একেবারে মূলগত এবং চূড়ান্ত সমাধান কর্মসংস্থান, সেক্ষেত্রে চিন বা জাপানের মতো কোনো সরকারের সঠিক নীতিমালার মাধ্যমে আফগানিস্তানও বিশ্বময় বাণিজ্য এবং টিকে থাকার আন্তর্জাতিক বলয়ে প্রবেশ করতে পারবে। আফগানিস্তানও বিশ্বময় লেনদেনে তার প্রকৃত অংশীদারিত্ব অর্জন করতে পারবে এবং পারবে এ অংশীদারিত্বের ব্যয়ভার বহন করতে। বর্তমান যুগের সভ্যতা ও আধুনিকায়নের সুবিধা আফগানিস্তানও নিতে পারবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আফগানিস্তানের অসুখ মোটেই বিপর্যয়ের পর্যায়ে চলে যায়নি।

যেদিন আমি আমার কোলে নিজের মেয়ে হান্নার বয়সী ১২ বছরের এক আফগান বালিকাকে ক্ষুধায় কাতরাতে দেখেছি, ক্ষুধার এই ট্র্যাজেডি আমি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিবারই নির্মম পরিসংখ্যানে গিয়ে ঠেকেছে আমার কলম। ও আল্লাহ! আফগানিস্তানের মতো এতো অসহায়-দুর্বল হয়ে গেলাম কেন? নিজেকে মনে হলো, সেই কবিতার মতো ভবঘুরে হয়ে পড়েছি। হেরাতি কবির মতোই হারিয়ে গেছি কোথাও কিংবা বামিয়ানের বুদ্ধের মতো, ভেঙে পড়েছি লজ্জায়;

পায়ে হেঁটে এসেছি এখানে
হেঁটেই ফিরে যাব।
যার ধন নেই, লোভ নেই
সে একই আগন্তুক হয়ে ফিরে যাবে।
আমার নির্বাসনের দণ্ড আজ রাতে
শেষ হয়ে যাবে,
সরিয়ে ফেলা হবে শূন্য টেবিল।
বড়ো ব্যথা নিয়ে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছি,
আমাকেই দেখেছে সবাই ছুটে যেতে,
যা কিছু আমার নয় সব রেখে চলে যাব,
পায়ে হেঁটে এসেছি
হেঁটেই ফিরে যাব।

কান্দাহারের দিনরাত্রি

(প্রসঙ্গ : আফগান প্রতিরোধ)

...'বিদেশি সৈন্যদের হারাতে কতদিন লাগবে?'

আবদুল হাদি জানিয়ে দিলেন সে একই কথা- যা এখন শোনা যায় পুরো আফগানিস্তানজুড়ে। ইসলামি বিশ্বাস হলো, কাল কী ঘটবে কেউ জানে না। 'একটি কথা আমরা জানি ও বিশ্বাস করি, আল্লাহ ওদের এখানে এনেছেন, তিনিই ওদের এখান থেকে নিয়ে যাবেন, নিশ্চিহ্ন কিংবা পরাভূত করে।'

নিজের জীবনকে যারা দামি মনে করেন, সন্ধ্যার পর কান্দাহারে ঘরের বাইরে বেরোনোর চেষ্টা এড়িয়ে চলেন তাঁরা। এসময়ের কান্দাহার যেন মৃত্যুফাঁদ। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে বাড়তে থাকে বিপদ। রাতে শোনা যায় হেলিকপ্টারের গর্জন। সন্দেহ করবার সুযোগ নেই এমন গ্রামগুলোতেও নৈরাজ্য সরবরাহ করা এসব আকাশযানের কাজ। শোনা যায়, বন্দুকের গুলির আওয়াজ। যার প্রতিধ্বনি উঠে নৈশ-নগরীতে। আফগানিস্তানের ভুলে যাওয়া যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনে নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। 'দুর্যোগের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে গেছে। এখন মানুষের একমাত্র কামনা '*তালেবানের প্রত্যাবর্তন*'। একথা ঠিক, কারজাই সবসময় *গণতন্ত্র গণতন্ত্র* বলে চিৎকার দিচ্ছে। বলছে, সব ঠিকাছে। কিন্তু এগুলো আসলে রূপকথা' এমন মন্তব্য পাঁচ সন্তানের জননী মারিয়া'র। 'আপনি যদি গৃহিনীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, দেখবেন ওদের চেহারা কতটা বিষণ্ন। দু'চারজন নয়, আমি সবার কথাই বলছি। যদি তাদের বাড়ি যান, ওদের স্বামীদেরও একই চেহারা দেখতে পাবেন। তাদের কাজ-কর্ম নেই। অচল হয়ে পড়ছে সংসারের চাকা। তাদের দুশ্চিন্তা নিরাপত্তা ও সন্তানের জন্য।' যোগ

করেন তিনি, 'বলছি কান্দাহারের কথা। আমি মনে করি, তালেবানের সময় আমাদের জীবন ভালোই কেটেছে। আমরা খাবার পেতাম, ছিল নিশ্চিন্তে ঘুমানোর সুযোগ। ঘর থেকে বেরিয়ে ঘুরতে পারতাম নির্ভয়ে। আর এখন? কোথাও যদি বেরোই, জানি না ঘরে ফিরতে পারবো কি না? যদি কোনো জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটে, আর সেসময় জায়গাটি অতিক্রম করে মার্কিনিরা, সন্দেহ নেই, সঙ্গে সঙ্গে ওরা আশপাশের প্রত্যেকের উপর গুলিবর্ষণ করবে। এখানে মানুষের নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। হাইওয়েতে কেউ গাড়ি চালাতে গেলে গাড়ি থামিয়ে তার কল্লাই হয়তো কেটে ফেলবে।'

জীবনে প্রত্যাবর্তন

'কান্দাহার' তালেবান আন্দোলনের সূতিকাঘার। এখানে এখন তালেবানের পুনর্জীবন হচ্ছে। তালেবানপরবর্তী দুঃশাসন ও নৃশংসতায় জনগণ অতিষ্ঠ। আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের এই প্রদেশের জনগণ তালেবানপরবর্তী দীর্ঘসময় মৃত্যু, ধ্বংস ও হতাশায় অবরুদ্ধ থেকেছে। শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মাঝে তাদের একমাত্র আশার আলো, শিগগিরই ন্যাটো নেতৃত্বাধীন বাহিনীর বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে।

দুই সন্তানের জনক ফয়েজ মোহাম্মদ কারিগর তালেবান আমলে কান্দাহার ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সে ফয়েজই চান তালেবান ফিরে আসুক। চোখে-মুখে অজানা শঙ্কা নিয়ে কথা বলছিলেন ফয়েজ। 'তালেবান আমলে আমি পালিয়ে ইরান সীমান্তে চলে যাই। কিন্তু পরিবারের জন্য আমার দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয়নি। অথচ বিগত একদশক প্রতিটি মিনিট আমার কেটেছে নিদারুণ উৎকণ্ঠায়। হতে পারে মাঝ রাতে মার্কিনিরা আমার ঘরে আসবে! ওরা সম্ভ্রমহানি করবে আমার স্ত্রীর, ছুঁড়ে ফেলে দেবে আমার সন্তানদের এবং আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে।'

ফয়েজ মোহাম্মদ জানিয়ে দিলেন, 'সিদ্ধান্ত নিয়েছি মার্কিনিদের রুখে দাঁড়াবো। আমি ওদের প্রতিরোধ করবো। এমনকি রাস্তায় দেখতে পেলে তাদের বিরুদ্ধে লড়বো- বাক, হাত ও বন্দুক দিয়ে- যেভাবেই হোক আমি ওদের মোকাবেলা করবো।'

নিরাপত্তা হারিয়ে গেছে

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি তালেবানের উত্থান ঘটে। কান্দাহারের বেপরোয়া অপরাধপ্রবণতা ও যুদ্ধবাজি থেকে মুক্তি নিয়ে তারা এঅঞ্চলকে দেয় নিরাপত্তা ও স্বস্তি। আর এই সময়ের কান্দাহার দেশের ভয়াবহ স্থানগুলোর একটি। অহরহ এখানে ঘটছে আত্মঘাতী হামলা। দিশেহারা ন্যাটোবাহিনী সেসব বেসামরিক নাগরিককে গুলি করে মারে, যাদের দেখে সেনারা ভাবে, বোমা ফাটিয়ে এরা নিজেকে উড়িয়ে দিল বুঝি! ভুল করেই মানুষকে সন্দেহ করা হচ্ছে।

'মানুষ আতঙ্কিত। এর অর্থ এই নয়, তারা মুজাহিদদের ভয়ে ভীত। তাদের আসল শত্রু বিদেশিসৈন্য। কাবুল সরকারের 'নিরাপত্তা বাহিনী'ও মানুষের চোখে দুশমন।' একটি গোত্রের মুরব্বি হাজি আবদুর রহমান বলেই দিলেন, 'সরকার একটি রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে একথা ভুলে যান। যদি রাস্তাও বানানো হলো, আপনিও খুন হলেন, তাহলে কি লাভ হলো?'

'পুলিশেরা দিনে-দুপুরেই ডাকাতি করে মানুষকে সর্বশান্ত করে ছাড়ে।' তিনি বলেন, 'সব ব্যাটা আস্ত ডাকাত। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আপনি যদি আমার গাড়িতে বসেন এবং আমরা গাড়ি চালিয়ে যেতে থাকি, কোনো তালেবান আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে না। কিন্তু পুলিশের ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না। ওরা যদি গাড়ি থামায়, শুধু টাকা-কড়িই নয় ইজারটাও খুলে নিতে পারে।'

ঘৃণিত দুশমন

কান্দাহার প্রদেশের পশ্চিমে পাঞ্জওয়ায়ি তালেবানের শক্ত ঘাঁটি। কয়েক মাস আগে ওই জেলায় বিদ্রোহী থাকার দাবি করে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সৈন্যরা বিমান হামলা চালায়। মার্কিন সন্ত্রাসীদের দাবি, এতে ৮০ তালেবান যোদ্ধা নিহত হয়েছে! কিন্তু ঘটনাস্থলের গ্রামবাসী বলছেন, হামলায় নিহতের অধিকাংশ বেসামরিক নাগরিক, নারী ও শিশু।

মৌলভী আবদুল হাই জানালেন, তাঁর পরিবারের ১৮জন ওই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। আরো প্রায় ৩০জন নিরীহ লোক নিহত হন। যার মধ্যে দু'বছরের

CamScanner

শিশুও রয়েছে। ক্ষোভের সঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি দেখালেন, কীভাবে ভিনদেশি সৈন্যরা জনগণকে ঘৃণাকারী শত্রুতে পরিণত করেছে।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী আবদুল হাদি মনে করেন, 'তালেবান এই দেশেরই সন্তান। আমার ছেলে তালেবান, আপনার ছেলে তালেবান।' তিনি আরো বলেন, 'তালেবান লড়াই করছে অধিকার, মানবতা ও ন্যায়ের স্বার্থে। ক্রুসেডার মার্কিনিরা দিন দিন পায়ের তলার মাটি হারাচ্ছে। দলে দলে জনগণ তালেবানের পেছনে এসে দাঁড়াচ্ছে।'

'বিদেশি সৈন্যদের হারাতে কতদিন লাগবে?'

আবদুল হাদি জানিয়ে দিলেন সে একই কথা- যা এখন শোনা যায় পুরো আফগানিস্তানজুড়ে। ইসলামি বিশ্বাস হলো, কাল কী ঘটবে কেউ জানে না। 'একটি কথা আমরা জানি ও বিশ্বাস করি, আল্লাহ ওদের এখানে এনেছেন, তিনিই ওদের এখান থেকে নিয়ে যাবেন, নিশ্চিহ্ন কিংবা পরাভূত করে।'

(এএফপি অবলম্বনে, ২০১০ সালে প্রকাশিত)

ইতিহাসের গোরেস্তানে

(প্রসঙ্গ : *ক্রুসেড সন্ত্রাস*)

...চিনুক হেলিকপ্টারে চড়ে সেখানে পৌঁছতে জেনারেল রবার্টসের মতো কুড়িদিন হয়তো লাগবে না। কিন্তু বৃটিশ সেনারা এমনকি এখনো কান্দাহারের কেন্দ্রীয় চত্বরে প্রবেশ করতে নারাজ। তারা যদি সেখানে প্রবেশ করে, তবে সতর্কতার সঙ্গে যেন ওখানকার প্রধান চত্বরে রাখা পুরনো কিছু কামানের দিকে লক্ষ্য করে। সম্ভবত ওখানেই, সবকিছু ফেলে পিছু হটে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন জেনারেল রবার্টস।

বসরা দখল করে বৃটিশ ক্রুসেডাররা ভেবেছিল, ভালবাসাপূর্ণ ফুলেল শুভেচ্ছা নিয়ে ইরাকিরা তাদের প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু তাদের সুখস্বপ্ন সহসায় মূর্তিমান আতঙ্কে রূপায়িত হয় কুত *আল-আমারায়* অবরুদ্ধ দখলদার বাহিনীর শোচনীয় পরিণতির মধ্য দিয়ে। একদিকে তুর্কি সেনার বোমাবর্ষণ, অন্যদিকে কলেরার প্রকোপ; দু'ধারী তলোয়ারের কোপে মরতে থাকে হাজার হাজার ক্রুসেডার সেনা। সময়টি ১৯১৫'র শরতের। 'একদা একদিন' টাইপের গল্প নয়, বলতে পারেন এটি ইতিহাসেরই পুনঃপাঠ। ১৮৮০ সালের ২৭ জুলাই *মাইওয়ান্দের* এরকমই এক যুদ্ধে ধ্বসে গিয়েছিল পুরো বৃটিশ ফোর্স। ইতিহাসের সেই গোরেস্তান আফগানিস্তানের চোরাবালিতে বৃটিশেরা আরো একবার আটকা পড়েছে। *মাইওয়ান্দের* হামলায় অংশ নেয় কাবায়েলি (উপজাতি) যোদ্ধারা। বীরত্ব ও স্বাধীনতাকে যারা নিজেদের সমার্থক করে ফেলেছিল। এক নজিরবিহীন বিপর্যয়ের পর কাবুলের বৃটিশ গভর্নর 'বাকিংহাম প্যালেসে' যে রিপোর্ট পাঠায় তাতে হামলাকারীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক 'তালেব' থাকার উল্লেখ করা হয়। এখনকার সংবাদভাষ্য, 'বৃটিশেরা হেলমান্দে নিরাপত্তা জোরদার করছে' যেন ওই

ইতিহাসেরই প্রতিধ্বনি। অবশ্য এর মধ্যে বৃটিশেরা হেলমান্দে কয়েকদফা পরাজিতও হয়েছে। সরকারি তরফে একথা স্বীকার করা না হলেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাতুর্যপূর্ণ বিবৃতি থেকে তার কিছুটা আন্দাজ করা গেছে। যদিও প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংবাদদাতাদের অনেকের দৃষ্টি তা এড়িয়ে গেছে। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'কোরিয়া যুদ্ধের পর বৃটিশ সেনারা হেলমান্দে সবচে কঠিন লড়াই লড়ছে।' এই শরতে (২০১০ সাল) হেলমান্দে তালেবানের সঙ্গে লড়াইরত একটি ইউনিটকে ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর জন্য বৃটিশ রয়েল এয়ার ফোর্স একটি গ্রাম প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। জনবসতিপূর্ণ ওই জায়গায় আসলে কোনো সেনা গ্যারিসন ছিল না। ওই গণহত্যা না চালালে হয়তো জেনারেল বারোজের ভাগ্য থেকে আলাদা হতো না জেনারেল নাইক কার্টারের ভাগ্যও। ১৮৮০ সালের ২৭ জুলাই মাইওয়ান্দে জেনারেল বারোজ যখন নিজেকে ১৫ হাজার আফগান লড়াকুর সঙ্গে যুদ্ধরত দেখতে পান, তখন তার ধারে-কাছে সহায়ক কোনো বিমানবাহিনী ছিল না। তার সঙ্গে ছিল মিসরীয় বিশাল এক রক্ষীবাহিনী এবং কান্দাহারে ছিল বৃটিশ সেনাদের শক্তিশালী ঘাঁটি।

বৃটিশেরা পূর্ব-পশ্চিমে যা করেছে আফগানিস্তান ছিল তারচে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির একটি দেশ। আর দশটা দেশ-জাতির চেয়ে আলাদা ছিল তাঁদের জীবনাচার। দখলদার বৃটিশেরা ভেবেছিল, উপমহাদেশের হিন্দুদের মতো এখানেও কিছু আফগানি 'রায় দুলর্ভ, উমি চাঁদ' তাদের সহযোগী হবে! কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। দখলদার সৈন্যদের নির্বিচার কচুকাটার মধ্য দিয়ে স্বাগত জানায় আফগানিরা। ওইসময় বৃটেনের প্রতিক্রিয়া ছিল আজকের চেয়ে ভিন্ন। বৃটিশ সেনাবাহিনী পরিচালিত হতো রাজতান্ত্রিক ভারত থেকে। ভারতে বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড লিটন কাবুলে তার লোক জেনারেল রবার্টসকে (কান্দাহারের লর্ড রবার্টস নামে পরিচিত) নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেয়। 'প্রত্যেক আফগানকে মৃত্যুর দরোজায় পৌঁছে দেওয়া হোক। প্রত্যেক বিদ্রোহীকে নির্বোধের আস্তানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে- আমি এটিই দেখতে চাই।'

জেনারেল রবার্টস নির্দেশ পালনে কসুর করেননি। কাবুলে সচারাচর সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন তিনি। প্রায় শ'খানেক আফগানকে চৌরাস্তায়

ঝুলিয়ে দেন ফাঁসি কাষ্ঠে। বিদ্রোহী আফগানদের নেতা ছিলেন আইয়ুব খান। কাবুলে বিদ্রোহের পর তাঁর ভাইকে রাজার পদ থেকে জোরপূর্বক হটিয়ে দেওয়া হয়। আইয়ুব খান পশ্চিমের মরুভূমি থেকে ঘুরে দাঁড়ান। যোদ্ধাদের পুরনো আবাসস্থলখ্যাত হেরাত থেকে তিনি কান্দাহারের দিকে রওয়ানা দেন। তাঁর মোকাবেলায় পাঠানো হয় দুর্ভাগা জেনারেল বারোজকে। শুরুর পরবর্তী প্রতিটি প্রহরে হাজার হাজার বৃটিশ ও ভারতীয় সেনা লুটিয়ে পড়তে থাকে। আইয়ুব খানের সেনাবাহিনী ৩০টি কামান দিয়ে বিভিন্ন অবস্থান থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবর্ষণ শুরু করেন এবং বিদ্যুৎগতিতে হামলা চালান মাঠে ও শুকিয়ে যাওয়া মাইওয়ান্দ নদীতে। লাল কাপড়ে মোড়ানো ৭৩৪ পৃষ্ঠার বৃটিশ সরকারি তদন্ত রিপোর্টে যেখানে লড়াই হয়েছিল, সে ময়দানের অনেকগুলো ছবি সংযুক্ত আছে। এখন বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে 'সংযুক্ত' সাংবাদিকদের পাঠানো ভিডিওচিত্রে আবশ্যকীয়রূপে ওই টিলা ও দূরবর্তী পাহাড়শ্রেণির ইঙ্গিত মেলে।

সশস্ত্র ও সুসজ্জিত বৃটিশেরা নিজেদেরকে নির্মম শত্রুর মুখোমুখি দেখতে পায়। ৩০ বোম্বে ইনফ্যান্ট্রির কর্নেল মেইনওয়ারিং দিল্লি কর্তৃপক্ষের কাছে মেরুদন্ড শীতল করে দেওয়া এক রিপোর্টে লিখেছিলেন, 'পুরো যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিল 'গাজিদের' দল। গাজিরা ছিল অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদার। তারা বৃটিশ সৈন্যদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে তলোয়ারের সাহায্যে তাদের গলা কেটেছে।'

জেনারেল বারোজের বিখ্যাত কুচকাওয়াজ বৃটিশ বাহিনীতে এখনো কিংবদন্তী হয়ে রয়েছে। কান্দাহারের ধ্বংসাবশেষ পেছনে ফেলে বিধ্বস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে পলায়নরত এই জেনারেল সম্পূর্ণ নিরাপদবোধ করবার আগপর্যন্ত একমহূর্তের জন্যও থামতে রাজি ছিলেন না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, ১৯১৭ সালে বাগদাদে দখলদার বৃটিশদেরকে ধারণাতীত বিদ্রোহের মোকাবেলা করতে হয়। মুজাহিদদের উপর্যুপরি হামলায় দিশেহারা হয়ে ক্রুসেড সেনারা। এখন যেমন ইরাক-আফগানিস্তানে মার্কিন ও ন্যাটোজোটের অবস্থা বিপর্যয়কর, ওই সময়ের অবস্থাও এরচে ভিন্ন ছিল না। সে সময়ের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ 'হাউজ অব কমন্সে' দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যেমনটি

CamScanner

এখনকার অভিনেতা ওবামার মুখেও শোনা যায়- '(দখলদার) বৃটিশ সেনাদের ইরাকেই অবস্থান করতে হবে'। তিনি আরো সতর্ক করেছিলেন, তা না হলে দেশটি 'গৃহযুদ্ধে' জড়িয়ে পড়বে!

বিশ্বের কোথাও বৃটিশবাহিনীর বৃহত্তম পরাজয় ঘটলে তা ঘটেছে মাইওয়ান্দেরও চার দশক আগে কাবুলের গর্জিতে, ১৮৪২ সালে। আফগান মুজাহিদেরা তুষারের মধ্যে পুরো বৃটিশ সেনাদলকে নিকেষ করে দেন। একমাত্র জীবিত ছিলেন বিখ্যাত হয়ে যাওয়া *ডাক্তার ব্রাইডন*। দু'জন আফগানকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে তাতে চড়ে জালালাবাদে বৃটিশ ঘাঁটিতে পৌঁছাতে সক্ষম হন তিনি।

বৃটিশেরা আবারো আফগানিস্তানে সেনাশক্তি বাড়াচ্ছে। চিনুক হেলিকপ্টারে চড়ে সেখানে পৌঁছতে জেনারেল রবার্টসের মতো কুড়িদিন হয়তো লাগবে না। কিন্তু বৃটিশ সেনারা এমনকি এখনো কান্দাহারের কেন্দ্রীয় চত্বরে প্রবেশ করতে নারাজ। তারা যদি সেখানে প্রবেশ করে, তবে সতর্কতার সঙ্গে যেন ওখানকার প্রধান চত্বরে রাখা পুরনো কিছু কামানের দিকে লক্ষ্য করে। সম্ভবত ওখানেই, সবকিছু ফেলে পিছু হটে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন জেনারেল রবার্টস। (ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবলম্বনে, ২০১০ সালে প্রকাশিত)

পুনশ্চ : দিন যতো যাচ্ছে তালেবানের বিজয় ও আমেরিকার পরাজয় স্পষ্ট হচ্ছে। বর্তমানে আফগানিস্তানের ৭০% এলাকা তালেবানের দখলে। এসব এলাকায় তারা নিজস্ব সরকার ও শরীয়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামি আইন অনুযায়ী এখানে বিচারকার্য সম্পাদন হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ, ট্যাক্স (উশর ও খেরাজ), আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক সবই তারা আদায় করছে। তাঁরা চিকিৎসাসেবা ও শিক্ষাব্যবস্থাও প্রণয়ন করেছে। পুরো দেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করে পৃথক পৃথক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। আছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়। *ইসলামিক ইমারাহ*'র প্রধান হচ্ছেন, আমিরুল মু'মিনীন। তাঁর অধস্তন দু'জন ডেপুটি আছেন এবং তাঁদের উপদেষ্টা হিসেবে আছে *শুরা পরিষদ*। প্রায় বছরধরে তালেবানের সঙ্গে আমেরিকার শান্তি আলোচনা চলছিল। চূড়ান্ত সময়ে এসে ট্রাম্প সরে দাঁড়ায়। থিঙ্ক ট্যাঙ্করা মনে করেন, এতে আমেরিকার ক্ষতি হয়েছে এবং তালেবানের স্পষ্ট বিজয় হয়েছে।

ভারতে মুসলমান হওয়ার অর্থ কী?

(প্রসঙ্গ : হিন্দুত্ববাদের মুসলিম নিপীড়ন)

...মুসলিম নারীরা পুলিশের কাছে সম্ভ্রম রক্ষার আবেদন জানালে পুলিশ বলে, 'তোমাদেরকে তো শেষমেষ মেরেই ফেলা হবে। তার আগে সম্ভ্রম থাকলো কি গেল তাতে কি?' গুজরাটের ঘটনায় হিন্দু সন্ত্রাসীরা ৫৬৩টি মসজিদ ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। আড়াই লাখ মানুষ হয় বাস্তুচ্যুত।

মুসলিম পরিচয়ের জন্য সময়টি কঠিন। ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে আরো কঠিন। ষোল ডিসেম্বর (২০১২ সাল) দিল্লির চলন্ত বাসে মেডিকেল ছাত্রী গণধর্ষণের ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হয় ভারতজুড়ে। রাজধানীসহ দেশজুড়ে বিদ্বজন থেকে শুরু করে আমজনতা, কবি থেকে অভিনেতা, সর্বস্তরের মানুষেরা –একযোগে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। দলবেঁধে লোকেরা মুখে কালো কাপড় এঁটে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ উপেক্ষা করে মোমবাতি হাতে রাস্তায় নেমে আসে। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, একই ধরনের অপরাধ যখন নির্বিচারে মুসলিমদের সঙ্গে করা হয়, তখন এসব নাগরিকের সুশীলপনায় নূন্যতম উৎসাহ জাগে না। যেই ভারত একজন নারীর সম্ভ্রমহানির খবরে উত্তাল হয়ে উঠতে পারে, সেই ভারতে মুসলিম নারীদের গণসম্ভ্রমহানির খবর চাপা পড়ে থাকে সংবাদ সীমানারও অনেক বাইরে! মুসলমান বলে তবে কি তারা মানুষও নয়!

বিখ্যাত একটি প্রবাদ আছে, '*Democracy Without Freedom is Demon Crazy*'। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র কীভাবে বৃহত্তম সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি করে, ভারত তার নিকৃষ্ট উদাহরণ...। সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি

CamScanner

ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় জনসমাজে নতুনও নয়। '৪৭-এর দেশভাগের পর তা আরো জঘন্য রূপ নেয়। হিন্দুত্ববাদের উদরে জন্ম নেওয়া এই ঘৃণিত দানব এখানকার সংখ্যালঘু মানুষের জীবন, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গিলে খেতে কখনো কুণ্ঠিত হয়নি। এজন্য গুজরাটের ভয়াল স্মৃতিই বারবার ফিরে ফিরে আসে। ভারত একদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নসিহত খয়রাত করে, অন্যদিকে 'বজরং, হিন্দুসভা, শিবসেনা' ও অন্য জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর নির্মমপীড়নে তড়পায় মজলুম মানবতা। **দলিত ভয়েস** সম্পাদক *ভিটি রাজশেখর* একবার লিখেছিলেন, 'জন্মসূত্রে আমি একজন হিন্দু। কিন্তু এখন আর আমি হিন্দু নই। আমি একজন মানুষ। কোনো হিন্দু মানুষ হতে পারে না।' ভারতের আজকের বাস্তবতা বলতে গেলে এমনই। পবিত্র জ্ঞানে পশুর মল-মূত্র পানকারীদের মন-মনন জঘন্য ও কুৎসিত হওয়া আদতে অস্বাভাবিকও নয়!

ভূ-আয়তনের দিক থেকে ভারত বিশাল দেশ। ২৮টি রাজ্য ও ছয়টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত এই দেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। মুসলিমরা দ্বিতীয় বৃহত্তম। আছে শিখ, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও আদিম ধর্মাবলম্বী জাতি ও নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। ১৯৪৭ সালে দখলদার ইংরেজ কর্তৃক দেশটির সর্বময় কর্তৃত্ব হিন্দুদের হাতে সমর্পণের পর থেকে এঅঞ্চলে স্থায়ী সংঘাত ও সংঘর্ষ বিরাজ করছে। দেশভাগের সময় হিন্দুদের হাতে প্রচুর মুসলমান প্রাণ হারিয়েছেন। পৈত্তিক ভিটে-বসতি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান ও তৎকালীন পূর্ববাংলায় হিজরত করেছেন অসংখ্য মানুষ।

মরছে মানুষ বেশুমার

'দাঙ্গা-হাঙ্গামা' বোঝাতে আমরা সাধারণত 'মারামারি' শব্দ ব্যবহার করি। যেখানে দ্বিপাক্ষিক সংঘাত-সংঘর্ষকে বোঝানো উদ্দেশ্য। 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' কথাটির মধ্যেও এধরনের কিছু উদ্দেশ্য হতে পারে। কিন্তু ভারতের মতো দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আসলে মারা হচ্ছে একপক্ষে, মরছে অন্যপক্ষ। 'দাঙ্গা' বা 'মারামারি' এক্ষেত্রে তাই যুতসই শব্দ নয়। উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগরের সাম্প্রতিক নিধনযজ্ঞের কথাই ধরা যাক। সংবাদমাধ্যম ভাষ্যে, উগ্র-হিন্দুদের

হামলায় এযাবৎ খুন হয়েছেন ৪৭ সাধারণ মুসলমান। হাজার হাজার মানুষ ভিত্তভিটে ছেড়ে নগরকেন্দ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। *আনন্দবাজার পত্রিকার* ভাষ্যে, প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে মুসলিম বিরোধী তৎপরতা চরম পর্যায়ে রয়েছে।

মুসলিমবিরোধী এই দাঙ্গার সূত্রপাত *কাউয়াল* নামের গ্রামে। এখানকার স্থানীয় কয়েকশ' হিন্দু কথিত *হিন্দু হত্যার* বিচার দাবিতে জড়ো হয়। এরপর 'বউ-বেটি সম্মান' নামে এক জনসমাবেশে জাঠ সম্প্রদায়ের লক্ষাধিক হিন্দু দূর-দূরান্ত থেকে এসে যোগ দেয়। এই সমাবেশ থেকে নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়ায়। *আনন্দবাজার গোষ্ঠির* সংবাদভাষ্যে, উগ্রপন্থী এই লোকগুলোর দাবি ছিল, 'গত মাসে জনৈক হিন্দু মেয়েকে মুসলমান ছেলেরা উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করতে গেলে মুসলমানদের হাতে কয়েকজন হিন্দু নিহত হয়'।

হিংসাত্মক আক্রমণের তৃতীয় দিনে মুজাফফরনগরের অবস্থা সম্পর্কে *বিবিসি* জানাচ্ছে, 'হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর মতো কোনো মালমশলারই অভাব নেই সেখানে। প্রদেশটির একের পর এক গ্রাম থেকে আতঙ্কিত মানুষ (মুসলিম) ট্রাক্টরে বোঝাই হয়ে ভিড় করছেন সদরে। প্রত্যন্ত এলাকার বহু গ্রাম জনশূন্য। জ্বালিয়ে দেওয়া ঘরবাড়ি থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে। দাঙ্গায় প্রাণহানির সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। এখনো প্রচুর মানুষ নিঁখোজ।' রাজনৈতিক দলগুলো এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির জন্য দোষারোপের খেলায় মেতেছে। শুধু মুজাফফরনগর নয়, দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশের জেলাতেও। শামেলি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট *পি কে সিং* জানিয়েছেন, 'শামেলিতে দাঙ্গার খবর পাওয়া গেছে। একজনকে গুলি করে হত্যার ঘটনা রেকর্ড করেছে পুলিশ'।

উত্তর প্রদেশ জনবহুল রাজ্য। চিনিকলের জন্য সুপরিচিত এই জেলায় প্রচুর আখের খেত আছে। একুশ কোটি মানুষের বসবাস এই রাজ্যে। রাজধানী দিল্লি থেকে একশ কুড়ি কিলোমিটার দূরে প্রদেশটির দাঙ্গা-আক্রান্ত মুজাফফরনগরে বহু মুসলমান বসবাস করেন। ভারতের যে প্রদেশগুলো প্রায় দাঙ্গার কবলে পড়ে

উত্তর প্রদেশ তার একটি। এখানে চলতি বছর (২০১৩ সালে) এরই মধ্যে ৪৫১টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। গত বছর সংখ্যাটি ছিল ৪১০।

যেভাবে সূত্রপাত

একটি ফেক ভিডিওকে *বিজেপি* (এমএলএ) ও উগ্রগোষ্ঠী *হিন্দুসভা ফোর্স* দাঙ্গা বাধানোর উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করে। ফেসবুকে ছড়ানো ওই ভিডিওতে বোনের সম্ভ্রম রক্ষার্থে ভাইয়ের জীবনহানির ঘটনা দেখানো হয়, যেটি পাকিস্তানের একটি ঘটনার ভিডিও। এর সঙ্গে হিন্দুগোষ্ঠী বা ভারতের আদৌ সম্পর্ক নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ১ সেপ্টেম্বর থেকে উগ্র-হিন্দুরা ফেসবুকে অপপ্রচার শুরু করে। '*We the Hindus*' নামের একটি পেজ থেকে '*2 hindus mercilessly beaten to death*' নাম দিয়ে একটি ভিডিও আপলোড করে দাবি করা হয়, জনৈক হিন্দু মেয়েকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদে এগিয়ে আসা দুই হিন্দু যুবককে দেড়শ' মুসলমান পিটিয়ে হত্যা করেছে। কয়েকদিনের ব্যবধানে পাঁচ হাজার আইডি থেকে ভিডিওটি শেয়ার করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে জানা যায়, এটি আসলে ২০১০ সালের ১৫ আগস্ট পাকিস্তানের শিয়ালকোটের একটি ঘটনার ভিডিও। *টুসার্কেলস ডটনেটে* এবিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

মুনাব্বর জানেন না ফিরতে পারবেন কি-না?

মুজাফফরনগরের সবচে শোচনীয় এলাকা খুতবা গ্রাম। এখান থেকে বেশ কটি মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতদের শরীরে আঘাত ও পাশবিক নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। গ্রামটির দোকান-পাটে ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয় উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা। মনসুরপুরে গুলিবিদ্ধ এক মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রশাসনের দাবি, 'শক্ত হাতে' পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে সিআরপি-পুলিশ। 'হিংসা' ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে ৫২জন।

ভারতের সরকারি তরফে অনেক কথাই বলা হচ্ছে, কিন্তু মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কিত। ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসা এসব লোক উগ্রহিন্দুদের হামলার

দুঃসহ স্মৃতি ভুলতে পারছেন না। মুজাফফরনগরের হাসপাতালে শুয়ে মুনাব্বর, অনুবেশ বালিয়ানরা জানিয়েছেন তাঁদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা। খুতবা গ্রামের বাসিন্দা মুনাব্বর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাঁর পরিবারকে। ওই সময় তাঁদের উপর হামলা চালায় হিন্দু সন্ত্রাসীরা। রড, লাঠি ও দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে আহত হন মুনাব্বর, তাঁর স্ত্রী ও আট মাসের সন্তান। তাঁরা এখন হাসপাতালে ভর্তি। আর কোনোদিন গ্রামে ফিরতে পারবেন কি না, জানা নেই তাঁর।

সারা রাত মাঠে লুকিয়ে থেকে হিন্দু সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে রক্ষা পেয়েছেন অনুবেশ বালিয়ান। লাঠি, তলোয়ার নিয়ে তাঁর উপরেও চড়াও হয় উগ্রবাদীরা। পরেরদিন সকালে সেনাবাহিনী তাঁকে উদ্ধার করে।

রাজনীতির বলি জনসাধারণ

একমাস আগে কাশ্মিরের কিশওয়ারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দুই সপ্তাহ আগে উত্তর প্রদেশে হিন্দুত্ববাদীদের আযোধ্যা যাত্রাকে কেন্দ্র করে ছড়ানো উত্তেজনার পর মুজাফফরনগরের মুসলিম গণহত্যা ফিকে হয়ে যাওয়া গুজরাটের প্রতিবিম্ব হয়ে ফিরে এসেছে...। বৃহত্তম গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার দেশে যখন মুসলমানদের কচুকাটা করা হচ্ছিল, তখনো ছিল নির্বাচনের ঘনঘটা (২০০২ সালে)। এবারও তাই।... ওইবার বিজেপি জেতে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে, এবারও কি তেমনটিই ঘটতে যাচ্ছে? অভিযোগ খোদ ক্ষমতাসীন সমাজবাদী পার্টির। তাদের বক্তব্য, 'এই দাঙ্গা উদ্দেশ্যমূলক, বিজেপি কর্তৃক সংঘটিত। ২০১৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে উগ্রহিন্দুদের ভোট পাওয়ার জন্য গুজরাটের পুনরাবৃত্তি করছে তারা। দাঙ্গা সৃষ্টির মাধ্যমে চরমপন্থী হিন্দুদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চায় উগ্র-হিন্দুত্ববাদী বিজেপি...।' সন্দেহ নেই, ধর্মের নামে এই গণনিপীড়নে ষোলআনা লাভ জঙ্গিবাদী বিজেপি-সঙ্ঘপরিবারের। মুজাফফরনগরের জনৈক মন্ত্রী অভিযোগ তুলে বলেন, 'আমরা

CamScanner

দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি, রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ভাঙন ধরিয়ে বিভেদ তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের চরম দুঃস্বপ্ন এখন সত্যি হতে চলেছে।'

মুজাফফরনগর রাজ্যের বিরোধী দল 'বহুজন সমাজ পার্টি'র নেতা মেঘবতী বলেন, 'এই দলগুলো এমনিতে ভোট পাবে না বুঝে এখন দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে মানুষের মধ্যে ভয় ছড়াতে চাইছে। বিশেষ করে উগ্র-হিন্দুদের ভোট পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।' মেঘবতী দিল্লিতে সাংবাদিকদের বলেন, 'রাজ্যসরকার খুব দেরিতে পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার ১০ দিন ধরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়তে দিয়েছে এবং আমি এটি বলতে পারি, তারা জঙ্গলের শাসন জারি করেছে।'

আলিগড়ভিত্তিক মুসলমানদের সংগঠন 'মিল্লাত বেদারি মুহিম কমিটি' প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের সরকারের পদচ্যুত করার দাবি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর শাসনের পরিবর্তে তাঁরা রাষ্ট্রপতির শাসন চেয়েছেন।

গণহত্যার নিয়তি

'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশ ভারতে মুসলিমদের উপর নিপীড়নের ঘটনায় চোখ বুঁজে থাকে রাষ্ট্র ও প্রশাসনযন্ত্র। দেশটির পুলিশ ও ব্যুরোক্রেসির মাঝে একটি চক্র আছে উগ্র-সাম্প্রদায়িক। স্মরণ করা যেতে পারে, গুজরাটে মুসলিমদের উপর চালানো নির্মম গণহত্যার হুকুমের আসামী নরেন্দ্র মোদি এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অন্যতম দাবিদার (২০১৪ সালে, নির্বাচনের প্রাক্কালে)। গণমানুষের উপর নির্বিচার হত্যায় অভিযুক্ত মোদিকে ভারতীয় হাইকোর্ট মামলা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে! গুজরাট রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকা ও মোদির ঘনিষ্ঠ লোক হত্যাযজ্ঞে অভিযুক্ত হওয়ার পরও সে ক্ষমা চায়নি। দুই হাজারেরও অধিক মুসলিমকে হত্যাসহ ওই সময় শত শত মুসলিম নারীকে গণধর্ষণের পর আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। পরিবারের অন্য সদস্যের সামনে ধর্ষণ করা হয় অসহায় মা-বোন-কন্যাদের। গর্ভবতী নারীরাও গেরুয়াধারীদের পাশবিকতা থেকে রেহাই পাননি। মুসলিম নারীরা পুলিশের কাছে সম্ভ্রম রক্ষার আবেদন জানালে পুলিশ

বলে, 'তোমাদেরকে তো শেষমেষ মেরেই ফেলা হবে। তার আগে সম্ভ্রম থাকলো কি গেল তাতে কি?' গুজরাটের ঘটনায় হিন্দু সন্ত্রাসীরা ৫৬৩টি মসজিদ ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। আড়াই লাখ মানুষ হয় বাস্তুচ্যুত। আমরা জানি, আহমেদাবাদের গণহত্যাই ইন্ডিয়ার শেষ মুসলিম গণহত্যা নয়। গুজরাট, আসাম, কাশ্মির আর উত্তর প্রদেশের পর আর কোন প্রদেশের পালা আসে কে জানে? তেত্রিশ কোটি দেবতার এই মানচিত্রে খোদাপরস্ত মানুষের স্থান যে দিন দিন সঙ্কুল ও সংকীর্ণ হয়ে উঠছে!

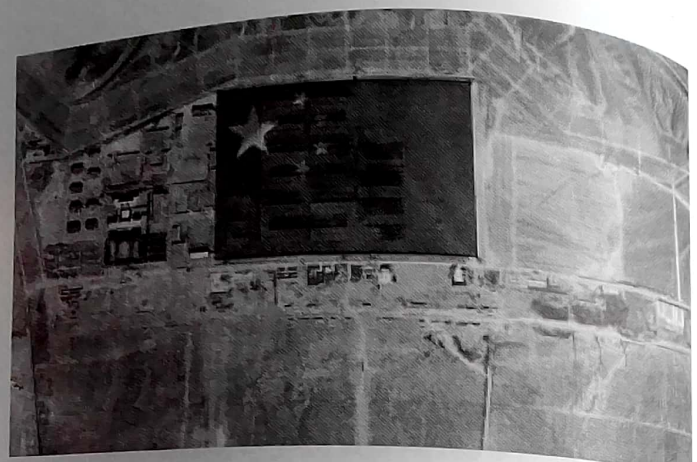
পুনশ্চ : আমাদের আশঙ্কাই সত্যি হলো। মোদি সরকার পর পর দু'বার নির্বাচিত হয়ে ভারতে হিন্দুত্ববাদী দর্শন এবং মুসলিমদের প্রতি উগ্র-বিদ্বেষ প্রচার করছে। মাত্র কয়েক বছরে, আরএসএস'এর রাজনৈতিক উইং 'ভারত জনতা পার্টি' পুরো ভারতকে হিন্দুত্ববাদে উসকে দিয়েছে। তাই মুসলিমদেরকে ধরে ধরে গণহারে পিটিয়ে, 'লাভ জিহাদের' কথিত অভিযোগে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা এখন সেখানে অহরহ ঘটছে। সর্বশেষ মোদি সরকার সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং ৩৫-এ ধারা বিলুপ্ত করে কাশ্মিরের বিশেষ স্ট্যাটাস বাতিল করেছে। কাশ্মিরকে ইসরঙ্গলি কায়দায় মুসলিমশূন্য করার এবং হিন্দু বাসস্থান তৈরির নীলনকশা তৈরি করা হয়েছে। এর জন্য ৮০ লাখ কাশ্মিরী মুসলিমকে নিজেদের ঘরবাড়িতে অবরুদ্ধ করে রেখেছে উগ্র-হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাসীরা। মোতায়েন করা হয়েছে ৯ লাখ হিন্দু ফৌজ। কাশ্মিরে কার্ফু বলবৎ আছে। টেলিফোন, ইন্টারনেট, টিভি-মিডিয়া -সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রো-ইন্ডিয়ান রাজনৈতিক নেতা ও দলকেও ছাড় দেওয়া হয়নি। সবাইকে করা হয়েছে গৃহবন্দী। মুসলিম পুলিশের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে লাঠি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৬০ দিন হতে চলছে, কার্ফু হটানো হয়নি এখনো। ইতোমধ্যে হাজারো কাশ্মিরী যুবক নিখোঁজ রয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে কয়েক হাজার মানুষকে। পরিস্থিতির ক্রমাবনতির ফলে *জেনোসাইড ওয়াচ* সংস্থা কাশ্মিরে গণহত্যার আশঙ্কায় জেনোসাইড এলার্ট (সতর্কতা) ইস্যু করেছে।

CamScanner

পূর্ব তুর্কিস্তান; উম্মাহর ভুলে যাওয়া ক্ষত

...কেউ মনে না রাখার দেশ পূর্ব তুর্কিস্তান। মরিয়ম, মেহেরগুলেরা যেখানে হামেশা তড়পায়, সম্ভ্রম বাঁচাতে পাঁচতলার খোলা কার্নিশ থেকে লাফিয়ে জীবন বাঁচায় যে দেশের তরুণীরা, 'মেকিং ফ্যামিলি' নামের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের বিছানায় যেতে বাধ্য করা হয় যে দেশের নারীদের, তাঁরা উইঘুর। কাশগড় বা উরুমতুশি নামের দেশের, পূর্ব তুর্কিস্তানের বাসিন্দা।...

৫৮ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত জিনজিয়াংয়ে উইঘুরদের ইতিহাস চার হাজার বছরের পুরনো। ১৬ লাখ ৪৬ হাজার ৪০০ বর্গকিলোমিটারের জিনজিয়াং আয়তনে বাংলাদেশের চেয়ে ১২ গুণ বড়ো। চিনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত অন্যতম সর্ববৃহৎ এই অঞ্চলটি দেশটির প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ। এর পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে আছে মুসলিম দেশ তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান ও কাজাখস্তান; দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে আফগানিস্তান ও জম্মু-কাশ্মির। ২০০৯ সালের এক হিসাব অনুযায়ী, জিনজিয়াংয়ে ১ কোটি ২০ হাজারের মতো উইঘুর বসবাস করেন। এই দেশ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী আরো অনেক দেশেই উইঘুরদের বসবাস রয়েছে। উইঘুর ব্যতীত এ অঞ্চলে আরো বাস করেন তাতার, কাজাক, উজবেক, তুর্কমেন ও তাজিক জাতি। 'উইঘুর' শব্দের অর্থ- 'সংঘবদ্ধ'। কুড়ি শতকের শুরুর দিকেও প্রাচীন এ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে 'উইঘুর' না বলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ডাকা হতো। ১৯২১ সালে উজবেকিস্তানে এক সম্মেলনের পর উইঘুররা তাঁদের পুরনো পরিচয় ফিরে পান। তাঁরা নিজেদেরকে সাংস্কৃতিক ও জাতিগতভাবে মধ্য এশিয়ার লোকজনের কাছাকাছি বলে মনে করেন। উইঘুরদের ভাষা অনেকটা তুর্কি ভাষার মতো।



ইতিহাসে উল্লেখিত স্বাধীন পূর্ব তুর্কিস্তানের অধিবাসীরাই আজকের উইঘুর, জিনজিয়াংবাসী। পূর্ব তুর্কিস্তান প্রাচীন সিল্ক রোডের পাশে অবস্থিত মধ্য এশিয়ার একটি দেশ। উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেকের শাসনামলে (৭০৫-৭১৫) খোরাসানের গর্ভনর কুতায়বা বিন মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ ৯৬ হিজরিতে পূর্ব তুর্কিস্তানের রাজধানী কাশগড় জয় করেন। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে চিনে তাং রাজবংশীয় শাসন ছিল। মুসলিম সেনাদের অগ্রাভিযানের মুখে চিনের তৎকালীন রাজা শুয়ানজং (*Xuanzong*) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং একটি প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে মুসলিম সেনাপতির কাছে চিনের মাটি প্রেরণ করে খেলাফতকে জিজিয়া দিতে সম্মত হন। কিন্তু খেলাফতের অভ্যন্তরীণ সংকটে মুসলিম সেনাপতির ফেরত আসার ফলে পূর্ব তুর্কিস্তান চিনের দখলদারীতে চলে যায়। পরবর্তীতে মধ্য এশিয়ার তুর্কি সেনাপতি সুলতান সাতুক বুগরা খান গাজী (মৃত্যু : ৯৫৫ সাল) দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাশগড় পুনরায় জয় করেন এবং পূর্ব তুর্কিস্তানে ইসলামি শাসন চালু করেন। ইসলামের আবির্ভাবের আগে উইঘুররা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী ছিল।

১৮৮৪ সালে কিং রাজত্বের সময় কাশগড়, উরুমতুশি অঞ্চলগুলো চিনা দখলদারিত্বের শিকার হয়। ১৯১১ সালে মাঞ্চু সাম্রাজ্য উৎখাত হলে পূর্ব তুর্কিস্তান জাতীয়তাবাদী চিনের অধীনস্ত হয়। কিন্তু স্বাধীনচেতা উইঘুরেরা

বিদেশি আগ্রাসনের সামনে মাথা নোয়ায়নি। উরুমতুশির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের হাতবদল হয় বহুবার। ১৯৩৩ ও ১৯৪৪ সালে দুই দফা অঞ্চলটি স্বাধীন থাকে। এই সময় উইঘুররা প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্র। চিনের জাতীয়তাবাদী সরকার ও স্তালিনের সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন পায় স্বাধীন এই রাষ্ট্রটি। কিন্তু ১৯৪৯ সালে মাও জে দংয়ের নেতৃত্বে চিনে কম্যুনিস্ট উত্থানে লাল বাহিনীর কাছে গৃহযুদ্ধে হেরে যায় জাতীয়তাবাদী সরকার। ক্ষমতার শুরুতেই কমিউনিস্টদের নজর পড়ে পূর্ব তুর্কিস্তানে। কমিউনিস্টরা তুর্কিস্তানকে চিনের সঙ্গে একীভূত করার প্রস্তাব রাখে। কিন্তু স্বাধীনচেতা উইঘুর নেতারা ওই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। এরপরই রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় একের পর এক প্রাণ হারাতে থাকেন পূর্ব তুর্কিস্তানের সব শীর্ষ উইঘুর নেতা। এসব বিমান দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে জেনারেল ওয়াং ঝেনের নেতৃত্বে বিশাল এক চিনা বাহিনী মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পূর্ব তুর্কিস্তানে হামলা চালিয়ে দেশটির দখল নেয়। দখলদারেরা এই ভূখন্ডের নাম পরিবর্তন করে রাখে 'জিনজিয়াং' বা 'নতুন দেশ'। তবে উইঘুররা নিজেদের 'পূর্ব তুর্কিস্তানি' পরিচয় বহাল রাখে।

চাইনিজ আগ্রাসনের পর থেকে এ অঞ্চলে চিনা হানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৯ সালের আগে জিনজিয়াংয়ে 'হান'রা ছিল ৬ শতাংশ। বর্তমানে প্রায় ৪০ শতাংশ। হান সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের বিরুদ্ধে এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কারণে বহু মুসলমান নির্যাতিত হন। উইঘুরদের উপর চালানো নিপীড়নের এই ইতিহাস খুবই হৃদয়বিদারক। সত্তুর বছরে চিন পূর্ব তুর্কিস্তানের প্রায় ৬০ মিলিয়ন মুসলিমকে হত্যা করেছে! ১৯৫২ সালে পূর্ব তুর্কিস্তানে এক লাখ কুড়ি হাজার মুসলিমকে ফাঁসি দেয় কম্যুনিস্টরা। যাদের বেশিরভাগ ছিলেন আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব তুর্কিস্তানে ২৯ হাজার মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়। যেগুলো অবশিষ্ট ছিল এখন সেগুলোও ভেঙে দিচ্ছে নব্য হালাকুরা!

১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১২০০ মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে চিন সরকার। কিছু মসজিদ হয়েছে কম্যুনিস্ট দলের আস্তানা বা ক্লাব। পূর্ব তুর্কিস্তানের রাজধানী উরুমতুশির ৩৭০টি মাদরাসা ও কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র আগুনে ভস্ম করে

দেওয়া হয়েছে। ৫৪ হাজার চাকুরীজীবী মুসলিমকে সেনাবাহিনীর কষ্টকর কঠিন কাজে জোরপূর্বক নিযুক্ত করা হয়েছে। নাচতে বাধ্য হচ্ছেন মসজিদের ইমাম। পুরুষদেরকে পাঠানো হচ্ছে 'রি-এডুকেশন' ক্যাম্প নামের কমিউনিস্ট দীক্ষাদানকারী জেলগুলোতে। শিশুদেরকে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বোর্ডিংস্কুল নামের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প ও অনাথ আশ্রমে। মেয়েরা বাধ্য হচ্ছে হান নাস্তিকদের বিয়ে করতে। রাস্তায় আটকিয়ে নারীদের শরীরের লম্বা জামা কোমর পর্যন্ত রেখে বাকিটুকু কেটে দিচ্ছে চায়না পুলিশ! *হিউম্যান রাইটস ওয়াচের* এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলিমদের বাড়িঘর কিউআর (*QR*) কোডসংবলিত নজরদারির আওতায় রয়েছে। এটি 'কুইক রেসপন্স' কোড নামে পরিচিত। উইঘুর লোকজনের পারিবারিক খুঁটিনাটি তথ্য জোগাড়ে এই সাংকেতিক ব্যবস্থা স্মার্টফোর প্লেটে স্থাপন করা হচ্ছে। বসানো হয়েছে মুখ দেখে সনাক্ত করা যায় এরকম ক্যামেরা। ফলে কোন বাড়িতে কারা যাচ্ছেন, থাকছেন বা বের হচ্ছেন তার উপর কর্তৃপক্ষ সার্বক্ষণিক নজর রাখতে পারছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের জনৈক সাংবাদিক কাশগড় ঘুরে সেখানকার জনজীবনের কিছু টুকরো চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সেখানে প্রতি ১০০ গজ দূরত্বে পুলিশ চেকপয়েন্ট বসানো। বন্দুক উঁচিয়ে, ঢাল নিয়ে মারমুখী অবস্থানে আছে পুলিশেরা। মুসলিম সংখ্যালঘুদের লাইনে দাঁড়িয়ে প্রদর্শন করতে হয় সরকারি পরিচয়পত্র। বড় বড় চেকপয়েন্টে তাঁদের থুঁতনি উঁচু করে দাঁড়াতে হয়। ছবি তোলা হয়। তারপর তাঁদের শনাক্ত করে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় তারা যেতে পারবেন কিনা। কখনো কখনো উইঘুর মুসলিমদের মোবাইল ফোন নিয়ে নেয় পুলিশ। চেক করে দেখে তারা এমন কোনো সফটওয়্যার ইন্সটল করেছে কিনা, যা দিয়ে বহির্বিশ্বে ফোনকল ও ম্যাসেজিং করা যায়। একজন পুলিশ কর্মকর্তা ওই সাংবাদিকের উঠানো একটি উটের ছবি মুছে দিয়েছেন। কিন্তু কেন? এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। ওই পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, চিনে 'কেন' বলতে কোনো প্রশ্ন নেই। উইঘুরদের ক্ষেত্রে এই নজরদারি আরো ব্যাপক। বাড়ি বাড়ি প্রশাসনিক পরিদর্শন কায়েম করেছে চিন। এই কর্মসূচির দাপ্তরিক নাম- 'হানদের সঙ্গে উইঘুরদের পুনর্মিলন উদ্যোগ'! পুলিশ ও নজরদারি কর্মকর্তারা যেকোনো

উইঘুরকে জিজ্ঞাসাবাদ ও বাড়িঘরে তল্লাশি করতে পারে। সকালে বা রাতে কোনো কিছুর পরোয়া না করেই তল্লাশি চালানো হয়। আটক ব্যক্তিদের বাচ্চাদেরকে এতিমের মতো নিয়ে যাওয়া হয় বহু দূরে। এভাবে হারিয়ে যাওয়াদের সংখ্যা কত, জানে না কেউ। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, শুধু গত বছরে কাশগড়ে এমন ৭০০০ শিশুকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। রাস্তা, ঘরের দরজা, দোকান, মসজিদ- সব স্থানেই নজরদারি ক্যামেরা বসানো।' *নিউইয়র্ক টাইমসের* এই সাংবাদিক আরো লিখেছেন, 'আমরা শুধু একটি সড়কের এক অংশে এমন ২০টি ক্যামেরা গণনা করে দেখেছি। একটি ছোট্ট দোকানে স্থানীয় অনেক মানুষ প্রতিদিন সমুচা কিনতে যান। এই দোকানটিতে এবং এর পাশের প্রতিটি দোকানে এমন ক্যামেরা বসিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে।' একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, কিন্ডারগার্টেনে ছোট্ট শিশুদের তারা জিজ্ঞেস করে- 'তোমার বাবা-মা কি পবিত্র কোরআন পড়েন? আমার মেয়ের এক সহপাঠী একদিন বলেছিল- আমার মা আমাকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেন। এর পরের দিন তারা কোথায় গেছেন বা তাদের কি হয়েছে কেউ বলতে পারে না।'

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, ধর্ম নিয়ন্ত্রণ ও সংখ্যালঘুদের ভাষাশিক্ষা নিষিদ্ধ করার চিনা নীতি জিনজিয়াংয়ে অস্থিতিশীলতার অন্যতম কারণ। ২০১৬ সালে 'মেকিং ফ্যামিলি' নামের একটি উদ্যোগ চালু করে চিন। এর মাধ্যমে উইঘুর পরিবারকে প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে পাঁচ দিনের জন্য তাঁদের ঘরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের 'হোস্ট' করতে বাধ্য করে। *ফ্রিডম ওয়াচের* মতে, পৃথিবীর অন্যতম ধর্মীয় নিপীড়ক দেশ চিন। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকায় এসব নিপীড়ন শুনতে পায় না বিশ্বের মানুষ। কালেভদ্রে যা কিছু জানা যায় তাতেই বোঝা যায় কোন দোজখে বাস করেন জিনজিয়াংবাসী। তুরস্ক চিনের উইঘুর সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনকে 'মানবতার জন্য লজ্জা' বলে আখ্যা দিয়েছে। একই সঙ্গে জিনজিয়াং প্রদেশে মুসলিমদের আটকে রাখা বন্দীশিবির বন্ধ করারও আহ্বান জানিয়েছে দেশটি। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক একটি কমিটি ২০১৮ সালের আগস্টে জানতে পারে চিন উইঘুরদের

স্বায়ত্তশাসিত এলাকাকে বন্দী শিবিরে পরিণত করেছে। সেখানে ১০ লাখের মতো মানুষকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এসব তথ্যের সঙ্গে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অভিযোগের মিল পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন *হিউম্যান রাইটস ওয়াচ* বলছে, যেসব লোকদের ২৬টি তথাকথিত 'স্পর্শকাতর দেশে' আত্মীয়-স্বজন আছেন তাদেরকে এসব ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান এবং তুরস্কসহ আরো কিছু দেশ। চিন বলছে তারা 'জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসীদের অপরাধমূলক তৎপরতা' মোকাবেলা করছে। এসব তথাকথিত শিক্ষাশিবিরে পাঠানো লাখো বিশিষ্ট উইঘুর ব্যক্তিত্ব গত কয়েক বছরে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

জেনেভায় ২০১৮ সালের অক্টোবরে জাতিসংঘের এক অধিবেশনে চিনা কর্মকর্তা বলেছেন, ১০ লাখ উইঘুরকে বন্দী শিবিরে আটকে রাখার খবর 'সম্পূর্ণ মিথ্যা।' কিন্তু তারপরে চিনের একজন কর্মকর্তা লিও শিয়াওজুন সাংবাদিকদের বলেছেন, চিন সেখানে কিছু 'প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' খুলেছে যেখানে লোকজনকে নানা ধরনের 'শিক্ষা' দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ওই ক্যাম্পগুলোর বাইরে যেসব উইঘুর আছেন, তারা কি ভালো আছেন? *নিউইয়র্ক টাইমসের* রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশটিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের মদ ও শূকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হয়, যা মুসলিম আইনে নিষিদ্ধ। *ফ্রি এশিয়ান রেডিওর* এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, স্বশাসিত কাজাখে সাহায্যের নামে কাঁচা শূকরের মাংস খেতে দিয়ে ছবি তুলে রাখা হয়। কাজাখ নারী কাসে বলেন, 'আমাদের প্রধান উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। নববর্ষ হান চিনা এবং যারা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী তারা পালন করে। আমরা এটি পালন করতে রাজি না হলে আমাদের দুটি জিনিস মোকাবেলা করতে হয়। কেউ বেশি জোর করলে পাঠানো হয় 'শিক্ষাশিবিরে'।' এদিকে স্যাটেলাইট ইমেজে দেখা গেছে চিন তাদের মুসলিমদের আটক শিবির সাত লাখ মিটার বিস্তৃত করেছে। *হিউম্যান রাইটস ওয়াচ* বলছে, যারা মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিদেশের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করেছে তাদেরকে টার্গেট করছে কর্তৃপক্ষ। মানবাধিকার সংগঠনগুলো আরো বলছে, এসব ক্যাম্পে যাদেরকে রাখা হয়েছে তাদেরকে চিনা মান্দারিন ভাষা শেখানো হচ্ছে। চাপ

দেওয়া হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর অনুগত থাকতে এবং নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সমালোচনা অথবা ধর্ম পরিত্যাগ করতে। এমনকি দখলদারেরা ঠিক করে দিচ্ছে মুসলিম শিশুদের কোন নামটি রাখা যাবে, কোনটি যাবে না।

২০১৬ সালের আগস্টে কাশগড়ের দক্ষিণে একখণ্ড জমি ছিল ফাঁকা। এখন সেটি নতুন করে বানানো 'রি-এডুকেশন' সেন্টার। সরকারের ভাষ্যে, এটি 'ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'। সাম্প্রতিক স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে, এই ক্যাম্পটি ২০ লাখ বর্গফুট এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। এটিই এখানকার একমাত্র ক্যাম্প নয়। কাশগড়ে এমন ১৩টি ক্যাম্প আছে। কোনো কোনোটির আকার-আয়তন কোটি বর্গফুট ছাড়িয়েছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর একাধিক প্রতিবেদনে উইঘুরদের উপর সরকারের নিপীড়ন ও অবদমনের এসব তথ্য উঠে এসেছে।

এতোসব নিপীড়নের প্রেক্ষিতে গত শতকের শেষের দিকে উইঘুর মুসলমানেরা স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন। যদিও উইঘুরদের নিজেদের মধ্যে প্রতিবাদের আদর্শিক ধরন নিয়ে বিবাদ আছে। কেউ তুর্কি জাতীয়তাবাদী, কেউ উইঘুর জাতীয়তাবাদী, কেউবা চাইছেন ধর্ম-ভাষা-ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যের মিশেল ঘটিয়ে নতুন রাজনীতি দাঁড় করাতে। সব ধারাই চিনা শাসনকে প্রতিপক্ষ ভাবে। স্বাধীনতার দাবিতে জিনজিয়াংয়ে *পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট* নামের একটি সংগঠন আছে, স্থানীয়ভাবে যা স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন বলে পরিচিত। তবে এর কর্মকাণ্ড এখন সীমিত। এর প্রতিষ্ঠাতা হাসান মাসুম অনেক আগেই নিহত হয়েছেন।

সত্তুর বছর ধরে জালিমের উনুনে জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছেন পূর্ব তুর্কিস্তানের ভূ-সন্তান সুন্নী উইঘুর মুসলমানেরা। ঐতিহাসিক সিল্ক রুটের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নিবিড়। প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের বেশ মিল। চাইনিজ আগ্রাসনের আগেও এই বিশাল ভূখণ্ড 'উইঘুরিস্তান' বা 'পূর্ব তুর্কিস্তান' নামে পরিচিত ছিল। চিনের কয়লার ৪০ ভাগ, তরল জ্বালানির ২২ ভাগ এবং গ্যাসের ২৮ ভাগ রয়েছে এখানকার মাটির নিচে। ভূরাজনৈতিক ভাষ্যকাররা বলেন, পূর্ব তুর্কিস্তানের খনিজ সম্পদই তার জন্য অভিশাপ। উইঘুরদের রয়েছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস। কিন্তু এই উইঘুররা আজ নিজের দেশে উন্মুক্ত

CamScanner

জেলখানায় বাস করছেন। চাইনিজ হানদের ব্যাপকভাবে অভিবাসিত করে দখলদারেরা জিনজিয়াংয়ের মূল অধিবাসীদের কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। চিন তার বন্ধুদেশগুলোকে চাপে রেখেছে সেসব দেশে অবস্থানরত উইঘুরদের ফেরত পাঠাতে। উইঘুরেরা যাতে প্রতিবেশী কোনো দেশের সহানুভূতি না পায়, সে ব্যাপারেও সচেষ্ট চিন। শক্তিশালী চিনের সঙ্গে কোনো দেশ সম্পর্ক খারাপ করতে চাইছে না! নিন্দা করে বিবৃতি দেওয়া ছাড়া অন্যদেশগুলো তেমন কিছু করেনি। তুরস্ক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কাজাখস্তানসহ পার্শ্ববর্তী সব দেশের সঙ্গে চিনের সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ এক দিক উইঘুর প্রসঙ্গ। 'অহিংসা পরম ধর্মের' বুদ্ধিষ্টরা চিনে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি, খাদ্যাভাস, চলাফেরার সঙ্গে মুসলিম সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতির ব্যবধান বিশাল। উইঘুরদের তাই অনাহূত ভাবা হয় এই সমাজে। ঘাত-প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ ক্রমাগত ভীতিগ্রস্ততার ভিতর একমুঠো জীবনের উইঘুরদের সামনে ভবিষ্যতের কোনো স্পষ্ট ছবি নেই। উইঘুর মুসলিমদের জীবন যেন ফাঁদে পড়া শিকারের মতো। আজান, নামাজ-রোজা নিষিদ্ধ। পর্দা করা চলবে না। এমনকি কেউ যাতে নামাজ আদায় করতে না পারে, এ জন্য ভেঙে ফেলা হয়েছে শত শত মসজিদ। এসব স্থানে গড়ে তোলা হয়েছে নতুন নতুন ভবন ও স্থাপনা। আগে যে জায়গায় মসজিদ ছিল, সেখানে এখন পর্যটনকেন্দ্র, পানশালা বা নাইটক্লাব! সরকারি অফিসে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের নামাজ-রোজা পালনে রয়েছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। ঘরের ভেতর মুসলিম নারী-পুরুষ কে কী করছেন, ঘণ্টা বা মিনিট গুণে সে হিসাবও রাখা হচ্ছে সরকারি নথিতে। ঈদের উৎসব পালন বা কোরবানি করার নাম কেউ নিয়েছে তো মরেছে। অন্ধকার দেশ চিন, বিভীষিকাময় জিনজিয়াং, উইঘুরিস্তান। কেউ মনে না রাখার দেশ পূর্ব তুর্কিস্তান। মরিয়ম, মেহেরগুলেরা যেখানে হামেশা তড়পায়, সম্ভ্রম বাঁচাতে পাঁচতলার খোলা কার্নিশ থেকে লাফিয়ে জীবন বাঁচায় যে দেশের তরুণীরা, 'মেকিং ফ্যামিলি' নামের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের বিছানায় যেতে বাধ্য করা হয় যে দেশের নারীদের, তাঁরা উইঘুর। কাশগড় বা উরুমতুশি নামের দেশের, পূর্ব তুর্কিস্তানের বাসিন্দা। তাঁরা এই উম্মাহরই অংশ। জ্বলে পুড়ে নিপীড়নে খাক হওয়া এই ব্যথাতুর সময়ে আমাদের পৌরষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন রেখে যাওয়া মানুষ।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এই উম্মাহ এক দেহের ন্যায়।' এর কোনো অংশে ব্যথা হলে তার রেশ ছড়িয়ে পড়ে পুরো শরীরে। কিন্তু আজকের ভুলে যাওয়া তুর্কিস্তান, নিপীড়ক চাইনিজদের জিনজিয়াং আমাদেরকে কী আসলেই ব্যথিত করে? এই উম্মাহ কি আমাদের কেউ নয়, নাকি আমরাই উম্মাহর কেউ নই। সম্ভ্রমহারা মায়েদের চোখে চোখ রেখে, হাত-পা কর্তিত বাবা-ভাইয়ের সামনে দিয়ে মাথা উঁচিয়ে জান্নাতের সদর দরজা পেরিয়ে যাওয়ার আশা আমরা কি এখনো জিইয়ে রেখেছি! তিলে তিলে বেঁচে থাকবার আশায় চামচিকার জীবনে আশ্রয় নেওয়া আমরাই কি একদিন টুপ করে মরে যাবো অজস্র মানুষের ভিড়ে! উইঘুরিস্তান, পূর্ব তুর্কিস্তান, জিনজিয়াং আমাদের সময়ে লজ্জা-অপমানের অপর নাম। আমাদের ঈমানি দৈন্যতা আর বুজদিলির খাতায় যোগ হওয়া আরেকটি উপাখ্যান! হে প্রভু, মহামহিম! ক্ষমা করুন। (-ইন্টারনেট অবলম্বনে পরিমার্জিত)

সৈন্যরা পরাজিত হয় মানুষের

চেতনা পরাজিত হয় না

(প্রসঙ্গ : *ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ*)

...বারিজের ওই প্রতিরোধে পুত্রহারা পিতা সেদিন গণজমায়েতের কাছে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আমি খুশি, আমার ছেলে নিজে জীবন দিয়ে অনেকের জীবন বাঁচিয়েছে।'

ইরাক আক্রমণের ঠিক আগে এক সাক্ষাৎকারে ডেভিড বার্সামিয়ান[১] অধ্যাপক নোয়াম চমস্কিকে[২] জিজ্ঞেস করেছিলেন, যুদ্ধ থামাতে সাধারণ মানুষ কী করতে পারে? চমস্কির উত্তর ছিল, 'দুনিয়ার কোনো কোনো এলাকায় মানুষ প্রশ্ন করে না- আমরা কী করতে পারি? যা করার তা তারা করে ফেলে।'

যার জন্ম ও বেড়ে উঠা গাজার উদ্বাস্তু শিবিরে, চমস্কির এই ধোঁয়াটে কথার মানে বুঝতে তার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। ১৯৮৯ সালে গাজার *বারিজ* উদ্বাস্তু শিবিরে কঠিন সামরিক কারফিউ চাপিয়ে দেয় ইসরঈল। এক ইসরঈলি সৈন্য মেরে ফেলার শাস্তি ছিল সেটি। *বারিজের* শত শত মানুষকে মেরে ফেলার

---

১ আর্মেনিয়ান-আমেরিকান রেডিও ব্রডকাস্টার, লেখক ও অলটারনেটিভ রেডিওর প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম : ১৯৪৫।

২ আবরাম নোয়াম চমস্কি, জন্ম ৭ ডিসেম্বর ১৯২৮। মার্কিন তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও সমাজ সমালোচক। বর্তমানে ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির এমিরেটাস (সংখ্যাতিরিক্ত) অধ্যাপক এবং ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজেনার সাম্মানিক (*Laureate*) অধ্যাপক।

স্বাভাবিক প্রতিশোধের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন হচ্ছিল। পরের কয়েক সপ্তাহে *বারিজের* আরো কিছু মানুষকে হত্যা করা হলো। ধ্বংস করা হলো উদ্বাস্তুদের ঘর-'খুপরিবাড়ি'। বৈশ্বিক গণমাধ্যমে এসবের খুব সামান্যই প্রকাশিত হয়েছে।

পার্শ্ববর্তী উদ্বাস্তু শিবির *নুসিরিয়া* ছিল মূসার আবাস। দারিদ্র্যে জর্জরিত এ উদ্বাস্তু শিবিরগুলো হয়ে উঠেছিল প্রতিরোধের জননভূমি। মূসার বাড়ি ছিল শহিদি *গোরেস্তানের* পাশে। জায়গাটি ছিল উঁচু। অতো উঁচু জায়গায় বসে শিশুরা ইসরঈলি সৈন্যদের গতিবিধি নজরে রাখতো। সৈনিকদের দেখতে পেলে শিস বাজিয়ে, অঙ্গভঙ্গি করে শিবিরে খবর পাঠাতো। এছাড়া তাদের আর কি-ইবা করার ছিল? নিরন্তর এই সংগ্রামে খুন হয় মূসার বন্ধু আলা, রায়েদ, ওয়ায়েলসহ আরো অনেকে।

অবরুদ্ধ বারিজ থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যেতো মূসাদের শিবির থেকেও। সবাই একত্র হয়ে কি করা যায় ভাবতে লাগলো। কিন্তু কোনোটিই কাজের কথা ছিল না। যদিও ওখানে দরিদ্র ও বন্দী মানুষদের হত্যা করা হচ্ছিল। ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না রেডক্রসকেও। অথচ যা করার এখনই করতে হবে এবং হঠাৎ তা শুরুও হয়ে গেলো। বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক আলোচনা কিংবা সম্মেলনের ডাক থেকে নয়, অকস্মাৎ পরিস্থিতির আঘাতে কিছু চিন্তা না করে নারীরাই বেরিয়ে এলেন। তাঁরা হাঁটা দিলেন বারিজের মৃত্যুপুরীর দিকে। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন আরো নারী-পুরুষ-শিশু। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ বারিজের সামনে জড়ো হলো। একজন বলে উঠলো, 'ওরা কতো মারবে? ১০০ জনকে মেরে ফেলার আগেই আমরা ওদের ছেয়ে ফেলবো।'

ইসরঈলি সৈন্যরা প্রতিবাদমুখর গণমানুষের সামনে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। মিছিলের অনেকেই আহত হলো, কিন্তু সেদিনের ঘটনায় নিহত হলো শুধু একজন। সৈন্যরা তাদের ব্যারিকেডের পেছনে চলে গেলো এবং এই ফাঁকে রেডক্রসের অ্যাম্বুলেন্স ও জাতিসংঘের গাড়িগুলো বিক্ষুব্ধ মানুষের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সবাই মিলে অবরোধ ভেঙে ফেললো।

মূসার এখনো পষ্ট মনে আছে, বারিজের বাসিন্দারা প্রথমে জানালা খুললো। তারপর ভয়ে ভয়ে খুললো দরোজা। এরপর পায়ে পায়ে এসে মিছিলে শামিল

হলো তাঁরা। কি ঘটছে তা তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিল না। একসময় সবাই আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। সেই স্মৃতি-উল্লাস, কান্না, মৃতদের ধরাধরি করে কবর দিতে ছোটা, অনেক হাতে আহতের শুশ্রুষা, বাইরের লোকদের খাবার ও শুভেচ্ছা- আজো মূসার মনে মানবিকসংহতির মহত্তম ছবি হিসেবে জ্বলজ্বল করছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদার (গণঅভ্যুত্থান) সময় এ দৃশ্য ফিরে ফিরে এসেছে। বরাবর ভয়ঙ্কর অন্যায় ও বর্বরতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ অতিসাধারণ পন্থায় রুখে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মনে হলেও সেগুলো ছিল সত্যিকারের অসাধারণ ও মানবিকপ্রতিরোধ। বারিজের ওই প্রতিরোধে পুত্রহারা পিতা সেদিন গণজমায়েতের কাছে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আমি খুশি, আমার ছেলে নিজে জীবন দিয়ে অনেকের জীবন বাঁচিয়েছে।'

পরেরদিন। বারিজের ঘটনার শাস্তি দিতে ইসরঈলি সৈন্যরা মূসাদের শিবিরে চড়াও হয়। কেউ অবাক হয়নি। যা করেছে তার জন্য অনুতপ্তও নয়। তাঁরা জানতো, কী করতে হবে এবং তাঁরা সোজাসুজি তাই করেছে। জনগণ যখন একসঙ্গে যাত্রা করে, দুনিয়ার ভয়ঙ্করতম শক্তিও তাঁদের রুখতে পারে না। এ ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচে বড়ো জেল ভাঙার ঘটনা। অনেক বিশ্লেষক হয়তো এই ঘটনা নিয়ে তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ করবেন। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের কাছে যা করার, তাঁরা তাই করেছেন। সৈন্যরা পরাজিত হয়। মানুষের চেতনা পরাজিত হয় না। গাজাবাসীর এ সামষ্টিক সাহসিকতা আমাদের সময়ের ইতিহাসে সবচে বড়ো প্রতিবাদ। রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক আবেদন-নিবেদন যা করতে পারেনি, ফিলিস্তিনি জনগণ বরাবর তাই করেছে। সমস্যা সমাধানের ভার তাঁরা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে এবং সফলও হয়েছে। যদিও এতেই তাঁদের অশেষ দুর্দশা শেষ হবে না। কিন্তু এ ঘটনা মনে করিয়ে দেয়, জনতার প্রতিরোধকে খাটো করে দেখা চলবে না। (*ফিলিস্তিন ক্রনিকলের* সম্পাদকীয় কলামের ছায়াবলম্বনে)

সব হারানোর বেদনা

(প্রসঙ্গ : *বাস্তুচ্যুতি ও নিপীড়ন*)

... হাজার হাজার মানুষের জীবন গেছে। মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য গ্রাম। ফিলিস্তিনিদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতির মধ্যে ধুঁকছে। তারা লড়াই করছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দুর্দশা, অনিশ্চয়তার মধ্যে।

পনের মে ফিলিস্তিনিদের ভাগ্যবিপর্যয়ের দিন। এ দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে নাম দেওয়া হয়েছে- 'নাকবা' দিবস। ১৯৪৭-৪৮ সালের এই দিনে ফিলিস্তিনিরা তাঁদের সর্বস্ব হারিয়েছিল। সবকিছুই। ভিটে-মাটি, স্বাধীনতা, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার অধিকার। এই কালো দিনে ফিলিস্তিনকে ধ্বসে দেওয়া হয়। ফিলিস্তিনের হৃদয়চিরে সূচনা হয় *ইসরঈল* নামের দুষ্ট ক্ষতের। আজো, এতোগুলো বছর পরও আমরা *নাকবা* স্মরণ করছি। আমরা যা হারিয়েছি, তার জন্য শোক করাই যথেষ্ট নয়; সেই ক্ষতির মাত্রা ও ধরন বোঝাও আবশ্যক মনে করি। এমনকি অজস্র মানুষের কাছে এখনো তার কী অর্থ, তা উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করি।

উপনিবেশিক বৃটিশের প্রত্যক্ষ সহায়তা ব্যতীত শত শত ফিলিস্তিনি গ্রাম ও শহরের ধ্বংসস্তুপের উপর *ইসরঈল রাষ্ট্র* প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না- এ সত্যটি অস্বীকার করা যাবে না। সেসময় একটি আন্তর্জাতিক 'অনুমোদন' বলে ইসরঈলের পাশাপাশি একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের ভারও বৃটেনের উপর ন্যস্ত

ছিল। কিন্তু ওই ওয়াদা পূরণ করার জন্য দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে ভুলে যাওয়ার জন্য। বৃটেন ও ফ্রান্সের উপনিবেশিক শাসনের কবলে সেসময়ের মধ্যপ্রাচ্য ছিল নিষ্পেষিত। এই দুটি উপনিবেশিক শক্তি এ অঞ্চলে তাদের স্বার্থমত ভাগ-বাটোয়ারা সম্পন্ন করেছে। ১৯১৬ সালে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পাদিত *সাইক্স-পিকট* নামে 'ভদ্রলোকদের' গোপন চুক্তিই এর বড়ো উদাহরণ। এই ষড়যন্ত্র-চুক্তির ফলে বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া অন্য দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। ১৯১৭ সালের নভেম্বরের পরে বৃটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শীর্ষ বৃটিশ জায়নিস্ট *স্যার এডওয়ার্ড রুথসচাইল্ডের* কাছে একটি গোপনপত্র প্রেরণ করেন। ওই পত্রে ইহূদিদের জন্য ফিলিস্তিনে একটি 'জাতীয় আবাসভূমি' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ফিলিস্তিন নিয়ে বৃটিশের ভাবনার বিষয়টি ওই পত্র থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে! এই ঘটনার পর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সংবাদভাষ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ফিলিস্তিনিদের তখন অভিহিত করা হতে থাকে, ফিলিস্তিনের 'অ-ইহূদি' অধিবাসী হিসেবে। পরের তিন দশক বৃটিশেরা ইহূদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে সুরক্ষা দিয়েছে কোনোপ্রকার রাখঢাক ছাড়াই। এখনকার আমেরিকার ভূমিকায় ছিল ওই সময়ের বৃটিশ। গোড়া থেকে বৃটিশেরা ফিলিস্তিনে গণহারে ইহূদি অভিবাসনের নীতি সমর্থন করে আসছিল।

৪৭-এর শেষের দিকে ফিলিস্তিন অঞ্চলে প্রধান মোড়ল হয়ে আবির্ভূত হয় জাতিসংঘ। স্থানীয় আরবেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ। বাকিরা ছিল বহিরাগত ইহূদি। অভিবাসী। একেবারে প্রথমে ফিলিস্তিনিরা ছিল জনসংখ্যার নব্বই ভাগ। পরে বৃটেনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'জাতিগত শুদ্ধি' (*Ethnic Cleansing*) অভিযানে আনুপাতিক এই অসম হারটি সমানুপাতিক হতে থাকে। এছাড়া অশুভ প্রক্রিয়ায় ক্রয় ও জবরদখলের বহু ঘটনাও ঘটে। জলের মতো তরল সত্যটি হচ্ছে, জমির মালিকানার বড়ো অংশই ছিল ফিলিস্তিনিদের।

বৃটেনের ইহূদি-সমর্থক নীতির জন্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'মিশ্রতা' এলেও ভূমি মালিকানা মিশ্র ছিল না। '*অ্যাথনিক ক্লিনজিং অব ফিলিস্তিন*' (ফিলিস্তিনের জাতিগত শুদ্ধিকরণ) বইয়ে *অ্যালান পে* লিখেছেন, '১৯৪৭ সালে ফিলিস্তিনের

সব আবাদি ভূমি ছিল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকারে। ইহূদি মালিকানায় ছিল মাত্র ৫ দশমিক ৮ শতাংশ ভূমি।' কিন্তু এ পরিসংখ্যানও কাউকে ফিলিস্তিনিদের রক্ষার তাগাদা দেয়নি। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের বিপুল চাপের মুখে ১৮১ নম্বর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। ওই প্রস্তাবে ফিলিস্তিনকে ভাগ করে একটি ইহূদি রাষ্ট্র, একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র এবং অধিকৃত জেরুসালেমকে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে রাখার কথা বলা হয়। আমরা জানি, এই কাগুজে প্রস্তাবনাও ক্রুসেডাররা এখনো পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেনি। একেবারে শুরু থেকেই ফিলিস্তিনিরা সবধরনের বিভাজনের বিরোধিতা করে এসেছে।

১৯৩৭ সালের বৃটিশ প্রস্তাবে আরবরা ক্ষিপ্ত হয় আর ৪৭'-এর সিদ্ধান্তে হয় বিপর্যস্ত। এই প্রস্তাবে ইহূদি রাষ্ট্রকে সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গমাইল ভূমি দেওয়ার কথা বলা হয়। বিপরীতে সাড়ে চার হাজার বর্গমাইল বরাদ্দ হয় ফিলিস্তিনিদের জন্য। যদিও তারাই ছিল ফিলিস্তিনের ৯৪ দশমিক ২ শতাংশ ভূমির মালিক এবং জনসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ। অন্যদিকে বাস্তবে প্রস্তাবিত ইহূদি রাষ্ট্রের মাত্র ৬০০ বর্গমাইল এলাকার অধিকার ছিল ইহূদিদের। এসব তথ্যের কোনোটিই জাতিসংঘের ৩৩ রাষ্ট্রকে ফিলিস্তিন-বিভাগের পক্ষে ভোট দেওয়া থেকে নিবৃত করতে পারেনি।

জাতিসংঘের এ বঞ্চনামূলক বিভাজন সত্ত্বেও জায়নিস্ট নেতারা চেয়েছিলেন আরো বেশি কিছু। এবং উৎসব করবার মতো উপলক্ষও পেয়ে গেলো তারা। 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়' যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে জায়নিস্ট রূপরেখাকে বিরাট উদারতার সঙ্গে বাস্তবায়নে লেগে যায়। ফিলিস্তিনিদের দুঃখ-বঞ্চনার দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি।

ফিলিস্তিনি ও আরবরা ভেবেছিল মার্কিন ক্রুসেডাররা যেহেতু বরাবর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা বলছে, সেহেতু তাদের চাপে বৃটেনের কলঙ্কিত নীতি আরবদের পক্ষে ঘুরে যাবে। কিন্তু তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরো চরম আঘাতে জেগে উঠার মুহূর্ত। বিচার ও বিবেকের সব সম্ভাবনা শেষপর্যন্ত

CamScanner

তিরোহিত হয়ে যায়। ফিলিস্তিনিরা যখন আসন্ন যুদ্ধের অনিবার্যতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, জায়নিস্ট নেতৃত্ব তখন ফিলিস্তিনজুড়ে দখলদারীর পরিকল্পনা হাতে নেয়। সে সময় জায়নিস্টদের প্রধান যুদ্ধ-সংগঠন ছিল হাগানাহ, পরিচালিত হতো জুইয়িশ এজেন্সি থেকে। এই এজেন্সি শুরু থেকে সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এভাবে *হাগানাহ* হয়ে উঠে তার সামরিক বাহিনী। এর মধ্যে ১৯৪৬ সালে ইঙ্গ-মার্কিন কমিটি হিসেব করে দেখে, ইহূদিদের রয়েছে ৬২ হাজার সুপ্রশিক্ষিত যোদ্ধা। আরবদের একজনও না। তারা আরবদের এই অক্ষমতার ব্যাপারে সজাগ ছিল। জাতিসংঘের মাধ্যমে দেশভাগ পরিকল্পনা পাস হওয়ামাত্রই ফিলিস্তিনি নিধন ও বিতাড়ন শুরু হয় মহা-উৎসাহে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে স্বদেশ বিভাজনের প্রতিক্রিয়ায় ফিলিস্তিনি গণবিক্ষোভকে 'দাঙ্গা' আখ্যায়িত করে জায়নিস্টরা সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে। গণআক্রমণের প্রাথমিক ধাক্কায় ৭৫ হাজার ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হন।

আরবদের সহযোগিতার গতি এতো শম্বুক ও শ্লথ ছিল, ফিলিস্তিনিরা আরো মুষড়ে পড়ে। তারা হয়ে পড়ে বিশ্বের সবচে অরক্ষিত জনগণ। লাখ-লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থী হয়। সর্বস্ব হারিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ে তারা। হৃদয়বিদারক এই ঘটনার পরিণতি দাঁড়ায় ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী। হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া হয় শত শত গ্রাম। ফিলিস্তিনিদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম মর্মান্তিক এই ঘটনার স্মৃতির মধ্যে ধুঁকছে। তাঁরা লড়াই করছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দুর্দশা, অনিশ্চয়তার মাঝে। তাই 'নাকবা' শুধু স্মরণের বিষয় নয়। এটি এমন এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবী যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আর কোনো পথ খোলা নেই। (*রামজি বারুদের কলাম অবলম্বনে*)

'যে জলে আগুন জ্বলে'

(প্রসঙ্গ : *বসন্ত বিপ্লব*)

...মানুবিয়া আজিজি সমাধিফলকের পাশে দাঁড়িয়ে *দি সান* পত্রিকাকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন আর তাঁর চোখ দুটো বারবার আর্দ্র হয়ে উঠছিল। এই জল শুধু সন্তান হারানোর বেদনারই নয়, গণমানুষের মুক্তি আনন্দেরও।

আরবদের নিস্তরঙ্গ জীবনে চাঞ্চল্য তৈরি হয় তিউনিসিয় বেকার যুবক মুহাম্মদ বুআজিজির আত্মহননের পথ ধরে। আর সব যুবকের মতো যিনি চেয়েছিলেন সামান্য একটি চাকরি, রুটিরুজির ন্যূনতম অবলম্বন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষে চাকরির আশায় ঘুরে বেড়িয়েছেন দ্বারে-দুয়ারে। ঘুষ দেওয়ার সামর্থ্য না থাকায় দরিদ্র আজিজি মাস ও বছর পেরিয়েও দেখা পাননি চাকরি নামের সোনার হরিণের। শেষপর্যন্ত পথে নামেন তিনি। সামান্য পুঁজি ধার করে ফলের ঝাঁকা কাঁধে ফেরি করতে শুরু করেন। এতে যৎসামান্য উপার্জন হতো, বৃদ্ধা মায়ের মুখে তুলে দিতে পারতেন দু'মুঠো আহার। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র সেখানেও বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তিউনিসিয়ায় ফুটপাত হোক বা কর্পোরেট- সব ব্যবসায় সরকারি অনুমোদন লাগে। আজিজির এধরনের কোনো অনুমোদন বা ট্রেড লাইসেন্স ছিল না। সরকারি দফতরে ঘুষ দিয়ে লাইসেন্স তৈরির সামর্থ্যও না। পুলিশ তাঁর ব্যবসা বন্ধ করে দিলো। কেড়ে নিলো শেষ সম্বলটুকু, ঋণ করে যা জোগাড় করেছিলেন তিনি। সব কটি পথ যখন রুদ্ধ হয়ে গেলো, বেঁচে থাকবার সবগুলো দ্বার যখন বন্ধ হয়ে গেলো, অভিমানী যুবক রাজধানীর ১২৫ মাইল দূরের শান্ত মফস্বল শহর *সিদি বুজিদের* নগরকেন্দ্রে পেট্রোল ঢেলে আগুন

লাগিয়ে দিলেন নিজের শরীরে। নিপীড়নের বিরুদ্ধে এরচে জোরালো প্রতিবাদের ভাষা আর তাঁর জানা ছিল না বুঝি! সিদি বুজিদের এই আগুন শুধু আজিজির দেহই পুড়িয়ে দেয়নি, তিউনিস জনতার হৃদয়েও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল মুহূর্তে। চাপা ক্ষোভ-ক্রোধ আর পুঞ্জিভূত ঘৃণার দাবালন সহসা জাগিয়ে তুলেছিল তিউনিসবাসীকে। ইতিহাসের নতুন যাত্রার সেই শুরু! মানুষের পৃথিবীকে নতুন এক গন্তব্যের ঠিকানা চিনিয়ে দিলেন একদিন আগেও অপরিচিত একজন আজিজি।...

আজিজির মতো করে একই শহরের অন্য এক যুবক বৈদ্যুতিক তার গায়ে পেঁচিয়ে আত্মাহুতি দেওয়ার পর পুরো তিউনিসিয়া আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠে। দুটি তাজাপ্রাণের আত্মহনন জাতির মন-মগজে ছড়িয়ে দেয় প্রতিরোধের আগুন। বাঁচা-মরা কবুল করে স্বৈরাচারী নিপীড়কের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে জনগণ। দলমত নির্বিশেষে জুলুমের বিরুদ্ধে রাজপথে একাট্টা হয় কার্যত অবরুদ্ধ একটি দেশ। ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর গায়ে আগুন দেন আজিজি। আগুনে ঝলসে গেলেও তাৎক্ষণিক মারা যাননি তিনি। আঠারো দিন হাসপাতালে যন্ত্রণাকাতর থেকে ৪ জানুয়ারি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আজিজি। এর দশদিনের মাথায় দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় নিপীড়ক-শাসক বিন আলি। শুরুতে শক্তিপ্রয়োগে গণমানুষের জাগরণ ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায় বলদর্পীশাসক। লাঠি ও বন্দুকের নল হয়ে উঠে তার প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু নিপীড়ক রাষ্ট্রের তীব্র দলনপীড়ন সত্ত্বেও জনতাকে দমিয়ে রাখা যায়নি। বিন আলি যখন বুঝতে পারলেন, রুখতে পারবেন না প্লাবন, শেষ অবলম্বন হিসেবে টিভি ভাষণে আশ্বাস দিলেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের। কিন্তু জনতার মন তাতে গলেনি।

বিপ্লবের শিকড় কত গভীরে!

তিউনিসিয়ায় পারিবারিক শাসনের বয়স অর্ধশতকের বেশি। বিন আলি ও তার পরিবার নিয়ন্ত্রণ করতো দেশের অর্থনীতি। দলীয় রাজনীতির বলয়ও ছিল সরকারের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সামরিক কারাগারগুলো ছিল ভিন্নমতাবলম্বী ও ইসলামপন্থী দলগুলোর কর্মী-সমর্থকে ঠাঁসা। পশ্চিমা প্রভুরা এতে যথেষ্ট খুশি

হয়। স্বৈরশাসকের পিঠ চাপড়ে বাহবা দেয় তারা। কিন্তু যুগ যুগ ধরে যে দেশে সযত্নে লালন করা হয় সেক্যুলারিজম, সে দেশের মানুষ কিভাবে ইসলামকে উপজীব্য করে জেগে উঠলো, তা এখনো বিরাট বিস্ময় হয়ে রয়েছে পশ্চিমা রাজনীতিক ও সমাজ-বিশ্লেষকদের কাছে। তিউনিসিয়াকে উত্তর আফ্রিকার সেক্যুলার সমাজব্যবস্থার মডেল বলে পাশ্চাত্য সবসময় চিৎকার করেছে। যদিও ইসলাম বরাবরই তিউনিসদের জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে থেকেছে। *হাবিব বরগুইবা* থেকে জয়নুল আবেদিন বিন আলি- ১৯৫৭ থেকে ২০১১; তিউনিসিয়ার ভূমি থেকে ইসলামকে মুছে ফেলার সবরকমের চেষ্টা চালানো হয় এই ৫৪টি বছর। রমজানে প্রকাশ্যে খাওয়া-দাওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপসহ সরকারি অফিস ও পাবলিক প্লেসে নারীদের হিজাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারিত সময়ে আজান ও প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া মসজিদ ব্যতীত নামাজ আদায় নিষিদ্ধ হয়। দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট *বরগুইবা* (১৯০৩-২০০০) নিজেকে দাবি করতেন *তিউনিসিয়ার কামাল আতাতুর্ক* বলে। ইসলামকে হারিয়ে দিতে চাইলেও আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় তার স্মৃতিশক্তি মুছে দেন। ১৯৮৭ সালে স্মৃতিভ্রষ্ট এই শাসককে অপসারণ করে ক্ষমতা নেন বিন আলি। যদিও বরগুইবা থেকে নিজেকে কোনো অংশে পিছিয়ে রাখেননি তিনি। জনগণের কথা বলার অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে শক্তির চাবুকে পিষ্ট করেছেন নিকৃষ্ট এই দুই স্বৈরশাসক। কিন্তু গাণিতিক সব সূত্র ও পূর্বানুমান উল্টে দেন ছাব্বিশ বছর বয়েসী তারেক আল-তইয়্যব মুহাম্মাদ বুআজিজি।

আজিজি গোটা বিশ্বের সন্তান

পুত্রশোকে কাতর নন মা *মানুবিয়া আজিজি*। আরববিশ্বকে জাগিয়ে তোলার মহানায়ক আজিজিকে গোটা বিশ্বের সন্তান মনে করেন মা মানুবিয়া। আজিজির আত্মহনন শুধু তিউনিসিয়া নয়, গোটা বিশ্বেই ধাক্কা লাগে। মানুষের মন-মস্তিষ্কের গভীরে দাগ কাটে এই আত্মাহুতি। তিউনিস বিপ্লবের রেশ ছড়িয়ে পড়ে মিসরে। গণআন্দোলনের তীব্র ঢেউ আঘাত হানে লিবিয়ায়, ইয়েমেনে। বর্তমানে মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম চলছে সিরিয়ায়। আজিজির মা 'দি সান' পত্রিকাকে দেওয়া এক

সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ছেলের জন্য আমি গর্বিত, এখন আরো বেশি গর্ব অনুভব করছি। মুহাম্মদ বুআজিজি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে গোটা আরববিশ্বে স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'আজিজি আমাদের জাতি এবং গোটা বিশ্বকে জাগিয়ে তুলেছে। সে আমার একার নয়; গোটা বিশ্বের সন্তান।'

পৈতৃক গ্রাম *সিভি সালার* মাটিতে চিরশয্যায় শায়িত আছেন আজিজি। এই মহানায়কের কবরের পাশে উড়ছে তিউনিসিয়ার লাল পতাকা। কবরে জলপাই আর ক্যাকটাস গাছ লাগানো হয়েছে। মানুবিয়া আজিজি সমাধিফলকের পাশে দাঁড়িয়ে *দি সান* পত্রিকাকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন। আর তাঁর চোখ দুটো বারবার আর্দ্র হয়ে উঠছিল। এই জল শুধু সন্তান হারানোর বেদনারই নয়, গণমানুষের মুক্তি আনন্দেরও।

পুনশ্চ : ২০১১ সালের গণবিপ্লবে তিউনিসিয়ার স্বৈরশাসক জয়নুল আবেদীন বিন আলি রিয়াদ পালিয়ে যাওয়ার পর দেশটিতে মোটা দাগে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে।

- ২০১১ সালের ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইসলামপন্থী আন-নাহদা বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। কিন্তু অভূতপূর্ব বিজয় সত্ত্বেও বরাবরের মতো এখানেও আলজেরিয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। মিডিয়া ও নিগূঢ় রাষ্ট্রের (রাষ্ট্রের ভেতর রাষ্ট্র) যোগসাজশে সেক্যুলার তৎপরতা ও পশ্চিমাদের চাপে দলটি ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য হয়। পশ্চিমা মিডিয়া বলেছিল, নির্বাচনে *আল-অরিধা* পার্টি জয়ী হবে। কিন্তু তারা তৃতীয় হয়। ফলে তাদের ইন্ধনে কথিত উদারনৈতিক রাজনৈতিক দলগুলো ইসলামপন্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা শুরু করে। ইসলামপন্থার জয়কে তারা গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি বলে প্রচারণা চালাতে থাকে। তারা মনে করে, সেক্যুলাররা জয়ী হলেই কেবল নির্বাচন 'সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ' এবং 'জনগণের প্রত্যাশা পূরণ' হবে। বিরোধীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে আন-নাহদা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। কয়েক দফা সরকার পরিবর্তনের পর শেষপর্যন্ত অন্তর্বর্তী প্রশাসন দেশটির দায়িত্ব নেয়।

- ২০১৪ সালের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে *বাজি কায়েদ সিবসির* (الباجي قائد السبسي) *নিদা তিউনিস পার্টি* জয় লাভ করে। এই *সিবসি* সাহেব বরগুইবার আমলে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিউনিসিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বিন আলি পরবর্তী অন্তবর্তী সরকারে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন (ফেব্রুয়ারি

২০১১-ডিসেম্বর ২০১১)। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি *নিদা তিউনিস* গঠন করেন। সেক্যুলারিস্ট এই পার্টিকে 'আধুনিকতাবাদী' দল হিসেবে অভিহিত করে পশ্চিমা ক্রুসেডার শক্তি। দল ভারী করতে সিবসি ক্ষমতাচ্যুত সাবেক স্বৈরতান্ত্রিক দল *ডেমোক্র্যাটিক কনস্টিটিউশনাল র‍্যালির* (বিন আলির পার্টি) একটি অংশকে কাছে টেনে নেন। রিপাবলিকান পার্টিও তাদের সঙ্গে যোগ দিলে ঘানুশির আন-নাহদা বেকায়দায় পড়ে। যদিও গণতন্ত্রের নির্লজ্জ পরিহাসে, বর্তমানে নাহদা ও নিদা তিউনিস জোটবদ্ধ হয়েছে। ফরাসিদের মধ্যস্থতায় প্যারিসে এই গোপন সমঝোতা অনুষ্ঠিত হয়।

- ২০১৬ সালের দশম কনফারেন্সে রাজনীতিক ইসলামের তল্পীধারী *আন-নাহদা* ইসলামপন্থার খোলস ভেঙে সেক্যুলার আলখেল্লা ধারণ করে। ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ, রাজনৈতিক ইসলামের পরিচয় ত্যাগ করে 'মুসলিম গণতন্ত্রী' পরিচয় ধারণসহ বেশ কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই কনফারেন্সে। দলটির প্রধান রশিদ ঘানুশি ধর্ম ও দলের মাঝের এই বিভাজনের ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'দ্বন্দ্ব-সংঘাত সমাধানের পথ হলো ঐক্যমত্য গড়ে তোলা এবং সহাবস্থানের ভিত্তি স্থাপন করা। এটি এখন প্রমাণিত। এ সংক্রান্ত তিউনিসিয়ার সাম্প্রতিক ভূমিকা 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের' স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আমরা এজন্য গর্বিত। আরব বিশ্বে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, তিউনিসিয়া তা প্রমাণ করেছে। দুর্নীতি, ঘুষ, স্বৈরতন্ত্র, বিশৃঙ্খলা ও *সন্ত্রাসবাদ* থেকে মুক্তির সমাধান গণতন্ত্র, আমরা এটি দেখাতে পেরেছি।' *বিবিসি সংলাপে* ঘানুশি আন-নাহদার এমন পরিবর্তনকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেন।

- ২০১৪ সাল থেকে প্রেসিডেন্ট পদে থাকা *সিবসি* ২৫ জুলাই ২০১৯ সালে মৃত্যুবরণ করলে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন নিদা তিউনিসের গভর্নিং বডির নেতা মুহাম্মাদ নাসের। যিনি বরগুইবার আমলে ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রী ছিলেন। ২০১১ সালে বিন আলির পলায়নের পর অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ গানুশির সরকারে (১৪ জানুয়ারি ২০১১-১৫ জানুয়ারি ২০১১) এবং পরবর্তীতে সিবসির সরকারেও তিনি মন্ত্রী ছিলেন।

- বিপ্লবের ফলে স্বৈরশাসক বিন আলির 'ডেমোক্র্যাটিক কনস্টিটিউশনাল র‍্যালি' (আত-তাজাম্মুয়ু দস্তুরিয়্যু দেমোক্রাতিয়্যু) বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিলুপ্ত দলটির নেতৃবৃন্দ পরবর্তীতে 'দস্তুরিয়ান মুভমেন্ট' নামে নতুন দল গড়ে তোলেন।

- সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী আইনের প্রফেসর কায়েস সাঈদ ২৩ অক্টোবর ২০১৯ থেকে তিউনিসিয়ার ৭ম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন।

CamScanner

- তিউনিসিয়ার বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ইসলামপন্থীরা আগের মতোই বেকায়দায় রয়েছে। যদিও এসব খবর বহির্বিশ্বে প্রচার করা হয় না।

- তানজিমে কায়েদা তিউনিসিয়ায় ধারবাহিকভাবে চলমান জুলুমের বিরুদ্ধে *কাতায়েব উকবা বিন নাফে* (উকবা বিন নাফে ব্রিগেড) নামে একটি প্রতিরোধী গ্রুপ গঠন করেছে। এই সেলটির তত্ত্বাবধায়ক আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরেব। দেশটির পার্বত্যাঞ্চলকেন্দ্রিক এই মুজাহিদীনগোষ্ঠীকে দমনে পশ্চিমা ক্রুসেডাররা সিবসি সরকারকে সেনা ও লজিস্টিক সাপোর্ট দিচ্ছে বলে তিউনিসিয়ার পররাষ্ট্র দফতরের বিবৃতিতে স্বীকার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আল্লাহর রসূলের সাহাবি উকবা বিন নাফে রাদিআল্লাহু আনহু মাগরেবিয় অঞ্চলগুলো বিজয় করেন। তিউনিসিয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

গণবিপ্লব ও গণতন্ত্রের কাকতাড়ুয়া

(প্রসঙ্গ : *সাম্রাজ্যবাদ ও মিসরের পরিবর্তন*)

কানাডিয়ান শিক্ষাবিদ *জিম মিলস* নিয়মিত কলাম লেখেন *ফিলিস্তিন ক্রনিকলে*। মিলস'এর লেখার ব্যতিক্রম, বৈশ্বিক চিন্তাধারার বৈপরীত্য; যেখানে দখলদারকে উপস্থাপন করা হয় ত্রাতার ভূমিকায়। একজন সৎমানুষের ভাবমূর্তি নিয়ে তিনি তুলে ধরতে চান সাম্রাজ্যবাদের ভণ্ডামির চেহারা ও মুখোশের আড়ালে লুক্কায়িত কুৎসিতরূপ। এই নিবন্ধ মিসরের গণবিপ্লব ও এ বিষয়ে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে।

মিসরে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত *ফ্রাঙ্ক ওয়াইজনারের* আল-জাজিরায় প্রচারিত সাক্ষাৎকারটির কথা ভেবে দেখুন। নাড়িভুড়ি উগলে উঠার মতো আলাপচারিতা এটি। শুধু কি মধ্যপ্রাচ্য? বিশ্বব্যাপী আমেরিকার ভণ্ডামি মানুষের ক্রোধ ও সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, মি. ওয়াইজনারের স্থূল চাতুর্যে পরিষ্কার তা বোঝা যায়। যদিও স্বভাবসিদ্ধভঙ্গিতে কূটনীতির জঞ্জাল থেকে তিনি রাজনৈতিক ভাষ্যের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কর্তৃত্বের সুরে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ও পুতুল সরকার বসিয়ে নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন সহজ, যেখানে স্বাধীন শাসন তাদের উপনিবেশের সমাধি ডেকে আনবে। জনমত উপেক্ষা করে স্বৈরশাসকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন তাই এক্ষেত্রে নতুন নয়। পশ্চিমের ভণ্ডামির স্বরূপ বুঝতে হলে আগে তাদের কথিত 'রাজনৈতিক সংস্কার' ও 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার বাচনিক হাকিকত বুঝতে হবে।

CamScanner

এসময়ের পশ্চিমা গণতন্ত্র দেশে-বিদেশে নানা রকমের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ডালপালা গজিয়েছে। বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রতিবন্ধক হওয়ায় উত্তর আমেরিকায় গণতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংসের নানা পশ্চিমি তৎপরতা আপনি লক্ষ্য করবেন। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকান অঞ্চলে সিআইএ কর্তৃক একই আচরণ দেখা যায়। এখনকার মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র ফেরি করবার যে কায়কারবার, তার লক্ষ্যও অভিন্ন। গণতন্ত্রের মুলো এখানে নয়া-উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এর আগে 'গণতন্ত্রের' নামে ইরাক ও আফগানিস্তানকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী ইতিহাসের প্রায় পুরোটা জুড়ে আছে বিদ্বেষ ও জিঘাংসার অসংখ্য নজির। মুক্তবাজার অর্থনীতির জেরে দেশে দেশে রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও নিজস্ব গুণ্ডাবাহিনী তৈরি করেছে এরা। শোনা যায়, এসব গোষ্ঠীকে সামরিক ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তহবিল জোগাতে ওয়াশিংটনে দপ্তর খোলার কথাও। রাজনৈতিক পেটোয়া দিয়ে স্বার্থোদ্ধার না হলে বরাবরের মতো সামরিক সংঘাত অনিবার্য করে তোলে সাম্রাজ্যবাদ। এধরনের নজির আমরা ইরাকে দেখেছি, আফগানিস্তানেও। এরও আগে উগান্ডা, ভিয়েতনাম ও ল্যাতিন আমেরিকায়। এছাড়া সিআইএ কর্তৃক পরিচালিত গোপন অভিযানের দীর্ঘ তালিকা তো রয়েছেই।

বোধসম্পন্ন মানুষের পক্ষে নিপীড়ন মেনে নেওয়া অসম্ভব। শিশু, নারী, সংখ্যালঘু, শ্রমিক- মৌলিক মানবাধিকার সবারই প্রাপ্য। উৎপীড়ন ও নির্দয় আচরণের প্রতিবাদে জনতা কখনো না কখনো একাট্টা হবেই। খোদ আমেরিকাতে আঠারো ও উনিশ শতকে মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও শ্রমিক অধিকারের দাবিতে বেশ কিছু আন্দোলন ও বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই সময়ের মিসরে জনসাধারণ রাষ্ট্রশক্তির নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। এই প্রতিরোধ ঠেকাতে রাষ্ট্রীয় গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশেরা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। পুলিশি নির্যাতন ও রাজনৈতিক পান্ডাদের হামলা সত্ত্বেও তাহরির স্কয়ারে অদম্য জনতার টানা আঠারোদিনের অবস্থান তাঁদের নির্ভীকতার পরিচয় বহন করে। এর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র নামক দেশটি নির্লজ্জভাবে স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের প্রতি সমর্থন

অব্যাহত রাখে। নিদারুণ বিরক্তির সঙ্গে আমাকে শুনতে হলো, হিলারি ক্লিনটন ও মি. ওয়াইজনারের 'গণতন্ত্রের' নসিহত। যদিও আমরা দেখেছি, ফিলিস্তিন ও ইসরাঈলের ক্ষেত্রে তারা কীরূপ সমতার (!) নীতি গ্রহণ করেছে। আমরা দেখেছি, মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সীমান্তনীতি ও দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের 'ত্রাণকর্তার' ভূমিকা! মেক্সিকো সীমান্ত ও ড্রাগ চোরাচালানের ক্ষেত্রে তাদের তৎপরতা! এই সীমাহীন দ্বিচারিতা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। দেশটির সামরিক বাজেট, পেন্টাগনের গোপন বাজেট ও নিরাপত্তা ব্যয় কেন প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে? তৃতীয়বিশ্বে তাদের বর্বরতা ও ধূর্তামি মানুষকে দাসানুদাসে পরিণত করেছে। সমরক্ষেত্র, বাণিজ্য, রাজনীতি– কোনো ক্ষেত্রেই থাবা বসাতে তাদের দ্বিধা নেই। ফিলিস্তিনে নির্বাচিত হামাস সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব দেখাতে ব্যর্থ জোড়াতালির পশ্চিমি গণতন্ত্র আমরা দেখেছি। আসলে তাদের মনে ভয়, জনতার শক্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তল্পীতল্পা গুটাতে হবে এই সমগ্র অঞ্চল থেকে। বিপ্লবের উত্থান-পতন নিয়ে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া থেকেও এর কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। যদিও এর ভূত-ভবিষ্যৎ এখনো অজানা। সত্যিকারের মুক্তি অর্জন করতে হলে, সর্বাগ্রে সামরিক ও স্বৈরাচারের প্রভাববলয় ভেঙে দিতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই তাদের সমর্থন সেসব একনায়কের উপর থেকে প্রত্যাহার করতে হবে, তাদের আশ্রয়-প্রশয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জনতাকে যারা অনুভূতিহীন যন্ত্রে পরিণত করেছে।

আমি আশা করি, মিসরের জনগণ যুক্তরাষ্ট্রের কবল থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হবেন। সন্দেহ নেই, এটি একটি যুগসন্ধিক্ষণ। মোবারকের শাসন ক্ষমতা উল্টে ফেলা ও তার কথিত সফল-শাসনের বিরুদ্ধে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলাফল যেন কেউ হাইজ্যাক করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ থাকা চাই। পুলিশি নির্যাতন, সামরিক হুমকি ও রাজনৈতিক পান্ডাদের আক্রমণ প্রতিহত করে জনতা যে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে, তার সত্যিকারের সুফল এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়। শুধু মোবারকের বিদায়ের মধ্য দিয়ে তা হবেও না।

আল-জাজিরাকে ধন্যবাদ মিসরে গণমানুষের বিপ্লব নিয়ে লাইভ কভারেজ কন্টিনিউ করার জন্য। পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও কর্পোরেট স্বার্থের বাইরে দেখতে নারাজ। স্বার্থহীন পৃথিবীতে তারা বরাবরই অন্ধ। সেক্ষেত্রে আল-জাজিরার জনগণের পক্ষে দাঁড়ানোকে দুঃসাহসই বলতে হয়। শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ রইল সাহসী আল-জাজিরার জন্য।

পুনশ্চ : আরব বসন্তের ঢেউয়ে মিসরে ৩০ বছর ধরে চলা দুঃশাসনের অবসান হয়। হোসনি মোবারক ক্ষমতাচ্যুত হন। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ইসলামপন্থী ইখওয়ান মেজরিটি ভোট পেয়ে জয়যুক্ত হয়। মুসলিম ব্রাদারহুডের লিডার হিসেবে প্রেসিডেন্ট হন মুহাম্মাদ মুরসি। হাসান আল-বান্না ও সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রাহিমাহুমুল্লাহর ইখওয়ান অবশেষে প্রায় ৭০ বছরের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে, পুরো দলকে মডারেট রূপ দেওয়ার পর ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ইসলামি গণতন্ত্রপন্থীদের মুখে চপেটাঘাত করে পশ্চিমারা বুঝিয়ে দেয়, গণতন্ত্র তখনই মানা হবে যখন তাতে কোনো সেক্যুলার সরকার জয়ী হবে। এটি ইসলামপন্থীদের জন্য নয়। হোক তারা মডারেট! যেই আমেরিকা বোমা মেরে প্রতিটি দেশে গণতন্ত্র চালু করা নিজের উপর ফরজ করে নিয়েছে, সেই আমেরিকা ও জাতিসংঘ নিরঙ্কুশ ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও ইখওয়ানকে অপসারণে সেনাদেরকে উস্কে দেয়। ফলে বছর না ঘুরতেই প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসি ক্ষমতাচ্যুত হন। মিসরের সেনা প্রধান আবদুল ফাত্তাহ আল-সিসি ২০১৩ সালের জুলাইয়ে সামরিক ক্যু করে মুরসিকে হটিয়ে ক্ষমতার দখল নেয়। মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রায় সব নেতাকর্মীকে জেলে ভরে, মিথ্যা মামলায় হাজারো মানুষকে জুডিশিয়াল কিলিং করে। মুরসিকেও বন্দী করে আদালতের মাধ্যমে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। যদিও ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর আগেই কারাগারে তিনি ইন্তেকাল করেন। সিসিকে একচ্ছত্রভাবে সাপোর্ট করে আমেরিকা-সৌদি-আরব আমিরাত জোট। ফলে মিসরে সামরিক শাসন জারী হয়। মানুষের উপর চালানো হয় নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, খাদ্যের দাম বেড়ে যায়, খাদ্য ও জ্বালানি সংকট তৈরি হয়। অর্থনীতি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। পাল্লা দিয়ে বাড়ে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা। অতঃপর প্রহসনের নির্বাচনে সিসির স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে গণতন্ত্রের রূপ দিয়ে বৈধতা দেওয়া হয়। সম্প্রতি মিসরের জনতা আবারো জেগে উঠেছে, আবারো উত্তাল হয়েছে

কায়রো। সংস্কারপন্থী ও গণতন্ত্রমনারা বেরিয়ে এসেছে। আগে থেকেই মাঠে আছে ইসলামপন্থীরা। দেখা যাক, এতে সিসির পতন হয় কি না? নাকি পতন হলে নতুন রূপে আসবে নতুন কোনো স্বৈরশাসক, পশ্চিমা পাপেট (পতুল)!

পশ্চিমাদের যুদ্ধ-খেলা ও গাদ্দাফির নির্মমতা

(প্রসঙ্গ : *লিবিয়া নিয়ে পশ্চিমা নীলনকশা*)

...গাদ্দাফি তাঁর ভাষণে বলেছেন, আমি আমার সেনাবাহিনীর জন্য বেনগাজি শহরের সমস্ত জানোয়ার বা প্রাণীগুলোকে হত্যা ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দি হিসেবে গোলাম বানিয়ে নেওয়াকে বৈধ ঘোষণা করলাম।

লিবিয়ার ৪২ বছরের একনায়ক স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে সেদেশের গণবিদ্রোহ জটিল পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। লিবিয়ার বেসামরিক জনগণকে রক্ষার অজুহাত দেখিয়ে পশ্চিমা সরকারগুলো ন্যাটো জোটের কাঁধে সওয়ার হয়ে সামরিক হস্তক্ষেপে মেতে উঠায় উত্তর আফ্রিকার এই দেশটিতে সংঘটিত গণবিদ্রোহ নতুন মাত্রা লাভ করেছে। লিবিয়ার জনগণ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলের মধ্য দিয়ে শুরু করেছিল গণবিদ্রোহ। স্বৈরশাসক গাদ্দাফি ও তার স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটানোর স্লোগান উচ্চারিত হয়েছে লিবিয়ার প্রায় সব ক'টি শহরে। গাদ্দাফি প্রশাসন প্রথম থেকে বেসামরিক জনগণের বিক্ষোভ প্রতিহত করার নৃশংস সামরিক দমন-অভিযানের পথ বেছে নেয়। গাদ্দাফি নিজে প্রতিবাদীদের *নিকৃষ্ট* বা *নোংরা জানোয়ার* বলে অভিহিত করেন। তাদের হত্যা করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন। গাদ্দাফিকে প্রতিহত করার দাবিতে সংগ্রামরত লিবিয়দের গুলি চালিয়ে 'ঠান্ডা' করার পন্থা বেছে নেওয়ায় দেশটিতে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ এবং পাশ্চাত্যের সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

লিবিয়ার কয়েকজন উচ্চপদস্থ সাবেক সেনাকর্মকর্তা, বেসামরিক সরকারি ও বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তা গাদ্দাফি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বেনগাজিতে একটি অন্তর্বর্তী পরিষদ বা অস্থায়ী সরকার গঠন করে চমক সৃষ্টি করেছেন।

গাদ্দাফি আফ্রিকার কয়েকটি দেশ থেকে ভাড়াটে সেনা এনেছেন। সাধারণ জনগণের মধ্যে তাকে সহায়তা করার জন্য যারা প্রস্তুত, তাদের জন্য অস্ত্রের গুদামও খুলে দিয়েছেন। গাদ্দাফির সেনারা বিপ্লবীদের দখলে থাকা কয়েকটি শহর পুনর্দখল করেছে বলে সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে। এখন তারা বিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটি বেনগাজির প্রায় ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে গেছে। গাদ্দাফি তাঁর ভাষণে বলেছেন, *আমি আমার সেনাবাহিনীর জন্য বেনগাজি শহরের সমস্ত 'জানোয়ার'কে হত্যা ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দি হিসেবে গোলাম বানিয়ে নেওয়াকে বৈধ ঘোষণা করলাম।*

গাদ্দাফি সরকারের সঙ্গে বৃটিশ ও ফরাসি সরকারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। স্বার্থের খেলায় সেই ঘনিষ্ঠতা আর টিকছে না। লন্ডন ও প্যারিস ইতোমধ্যে লিবিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এই হস্তক্ষেপের লক্ষ্য এক ঢিলে বহু পাখি মারা।

গাদ্দাফির নৃশংস গণহত্যা লিবিয়ায় তাকে কতটা ঘৃণ্য ব্যক্তিতে পরিণত করেছে, শক্তিপ্রয়োগে তার পতন ঘটানোর চেষ্টায় দেশটির খুব কম নাগরিকের আপত্তি আছে বলে মনে করা হয়। এ অবস্থায় নিরস্ত্র জনগণের উপর গাদ্দাফি সেনাদের বিমান হামলা বন্ধ ও বেসামরিক লিবিয় নাগরিকদেরকে রক্ষার অজুহাতে দেশটিতে *নো ফ্লাই জোন* (বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ অঞ্চল) গঠন সংক্রান্ত ইঙ্গ-ফরাসি প্রস্তাব ১৭ মার্চ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাশ হয়।

১৯৯৯ সালে সার্বিয়ার উপর এবং ২০০৩ সালে ইরাকের উপর ন্যাটোর বিমান হামলার অভিজ্ঞতা থেকে এটি স্পষ্ট, *নো ফ্লাই জোন* গঠন লিবিয়ায় পাশ্চাত্যের সামরিক হস্তক্ষেপের অজুহাত মাত্র। পাশ্চাত্য গাদ্দাফির দানবীয় চরিত্র সম্পর্কে ঠিকই সচেতন। তারা জানে, যে লোক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে নাগরিকদের উপর গণহত্যা চালাতে দ্বিধান্বিত নয়, সে আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা করবে না। পশ্চিমা শক্তি জাতিসংঘে *নো ফ্লাই জোন* গঠনের প্রস্তাব পেশ করে। স্বভাবতই গাদ্দাফির সেনারা ওই প্রস্তাব লঙ্ঘন করায় লিবিয়ায় ন্যাটোর সামরিক হস্তক্ষেপের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। ন্যাটো জোটের ব্যানারে হস্তক্ষেপের সুবিধা, এ অভিযানের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামরিক ব্যয়ভার শুধু একটি বা অল্প কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমিত না থাকা। মার্কিন সরকারও

লিবিয়ায় ন্যাটোর সামরিক আক্রমণকে সমর্থন করেছে। আফগানিস্তানে ন্যাটোর ব্যর্থতার পটভূমিতে লিবিয়ায় এ জোটের সাফল্য এটি প্রচারের সুযোগ এনে দিয়েছে, ন্যাটো ইউরোপের বাইরে মার্কিন সরকার ও তার ইউরোপিয় মিত্রদের আর্থ-রাজনৈতিক ও সামরিক লক্ষ্যপূরণে সক্ষম।

লিবিয়ায় গাদ্দাফি বাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়া এবং গাদ্দাফি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য পাশ্চাত্যের তেমন আগ্রহ না থাকায় দেশটিতে পাশ্চাত্যের সামরিক আক্রমণের দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যগুলো নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনার অবকাশ দেখা দিয়েছে। তুর্কি প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুল বলেন, 'লিবিয়ায় ন্যাটোর সামরিক হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য জনগণকে মুক্ত করা নয়। তাদের অন্য উদ্দেশ্য ও স্বার্থ রয়েছে।' তাঁর প্রশ্ন, 'যারা বহু বছর ধরে গাদ্দাফিকে সহায়তা দিয়ে এসেছে, তারা এখন *নো ফ্লাই জোন* গঠন করে রাতারাতি নীতি পরিবর্তন করেছে কেন?' আবদুল্লাহ গুল মনে করেন, 'ইরাকের সম্পদ লুট করা হয়েছে। এবার লিবিয়ার সম্পদও লুণ্ঠিত হবে।' তুরস্ক ন্যাটোর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও দেশটির প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্য তাৎপর্যের দাবি রাখে।

মার্কিন সরকার ও ন্যাটো লিবিয়ায় সামরিক আক্রমণ চালিয়ে দেশটিতে গাদ্দাফির সেনা ও বিদ্রোহীদের সামরিক শক্তিকে সমান রাখতে চায়। বিদ্রোহীদের মোকাবেলায় গাদ্দাফি সেনাদের মূলশক্তি যুদ্ধবিমান। *নো ফ্লাই জোন* ও সেনা-অবস্থানের উপর ন্যাটোর হামলার ফলে গাদ্দাফির বিমানশক্তি অচল হয়ে গেছে। ন্যাটো এখনো গাদ্দাফি সেনাদের মূল কাঠামোর উপর হামলা না চালিয়ে ছোটখাট টার্গেটে সীমিতমাত্রায় বিমান হামলা চালাচ্ছে। এসব হামলার উদ্দেশ্য, গাদ্দাফি ও বিদ্রোহীদের মধ্যে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করা। ন্যাটো জোর প্রচেষ্টা চালালে কয়েক দিনের মধ্যেই গাদ্দাফির গোটা বাহিনীকে অচল করে দিতে পারতো। তারা উভয় পক্ষকে ক্লান্ত ও দুর্বল করার কৌশল বেছে নিয়েছে। পক্ষ দুটি যথেষ্ট মাত্রায় দুর্বল হলে ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে পশ্চিমারা আলোচনার টেবিল সাজাবে। এরপর তাদের অনুগত ও পছন্দসই একটি সরকার গঠন করবে। আল-কায়েদার একজন থিঙ্কট্যাঙ্ক এ বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, *লিবিয়ায় একজন কারজাই পাওয়া গেলে তারা তড়িঘড়ি আলোচনার টেবিলে বসবে।*

CamScanner

লিবিয়ায় মার্কিন সরকার ও ন্যাটোর আরেকটি লক্ষ্য, রাশিয়া, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনা গাদ্দাফির বিভিন্ন মডেলের অত্যাধুনিক জঙ্গি বিমান ও সামরিক সাজসরঞ্জাম ধ্বংস করে দেওয়া। গাদ্দাফির পতনের পর লিবিয়ায় যে সরকারই ক্ষমতাসীন হোক, তারা দেশটির পুনর্গঠনের জন্য অস্ত্র কেনা বাবদ পাশ্চাত্যের অস্ত্র কম্পানিগুলোর পকেট ভরে তুলবে তেলের অর্থে। বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সশস্ত্রবাহিনীকে পুনর্গঠনের জন্য ভবিষ্যত সরকার পাশ্চাত্যের আর্থিক ও সামরিক অনুকম্পার মুখোমুখী হবে। ফলে তারা পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণে সদা নিবেদিত থাকবে। লিবিয়ার তেল সম্পদ লুণ্ঠন ও দেশটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করার এতো উৎকৃষ্ট সুযোগ তাদের জন্য আর কবে মিলবে? (ইন্টারনেট অবলম্বনে ২০১১ সালে প্রকাশিত)

পুনশ্চ : একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেন, 'উত্তম বিকল্প নিশ্চিত না করে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জাতির জন্য আরো বেশি অকল্যাণকর।' লিবিয়ার ক্ষেত্রে এমনটিই হয়েছে। গাদ্দাফির পরের দুই বছর মানুষ একটু শান্তি ও সমৃদ্ধি পেলেও এর পরেই শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। এদিকে *আইসিসের* উত্থানের যুক্তি ধরে এক এক করে সুপার পাওয়ারেরা ফিরে আসে লিবিয়াতে। দিন রাত ধরে চলে বোম্বিং। প্রায় ৭ বছর ধরে লিবিয়া এভাবেই আছে। ত্রিপোলি রণক্ষেত্র। আছে সামরিক শক্তি, গণতন্ত্রপন্থী, ইসলামপন্থী ও সংস্কারপন্থীরা। দল তৈরি হয়েছে অনেক। আইসিস, পশ্চিমা ক্রুসেডার, অভ্যন্তরীণ গাদ্দার, সবাই আছে এখানে। কয়েকদিন পূর্বে মার্কিন বাহিনীর বিমান হামলায় ২০জন মারা গিয়েছে। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় *Government of National Accord* (*GNA*) তৈরি হয়েছে ২০১৫ সালে। এরপর একে অস্থায়ী সরকারের রূপ দেওয়া হয়। ২০১৬ সালের পর *খালিফা হাফতারের* (লিবিয়ায় পশ্চিমা পুতুল) লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, একে একে অয়েল ফিল্ডগুলো (তেলক্ষেত্র) নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে অভিযান চালায় বিভিন্ন শহরে। কথিত আইসিসের নাম করে ইসলামপন্থীদের নির্মূল করার মিশন নিয়ে নামে সে। বেনগাজি দখলের পর তার সঙ্গে প্রো-জিএনএ ফোর্সেরও সংঘর্ষ বাধে। এখনো যা চলমান। এখন হাফতার পুরো শক্তি নিয়ে ত্রিপোলির দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছে। *GNA* ত্রিপোলিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

সিরিয়া মধ্যপ্রাচ্যের আফগানিস্তান

(প্রসঙ্গ : *নুসাইরি বাসারের নিপীড়ন*)

...বিপুল সমরাস্ত্র, বিরাট জনশক্তি ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর বিপরীতে সিরিয়ায় মুক্তিকামী মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি গ্রুপ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এই দলগুলোর মধ্যে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'নুসরা ফ্রন্ট'কে সবচে কৌশলী ও শক্তিমান মনে করা হয়। পাশ্চাত্যপন্থী ফ্রি সিরিয়ান আর্মি কোয়ালিশন, গণতান্ত্রিক ও সালাফি কিছু দলও সক্রিয় আছে। এছাড়া *দোহা* ও *আঙ্কারায়* গোলটেবিলের আয়োজন এবং গণমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে 'দায়িত্ব' পালন করবার মতো লোকের উপস্থিতিও রয়েছে।

আঞ্চলিক ও 'আন্তর্জাতিক শক্তি'গুলোর প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ছে হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ শামদেশ- আজকের সিরিয়া। শিয়া নুসাইরী গোষ্ঠীর ক্ষমতা লিপ্সা, খুনী ও কসাই বাসার আল-আসাদের একগুয়েমি ও কয়েক প্রজন্ম সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নীদের উপর দমন-পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় *রবিউল আরাবি*-আরব জাগৃতির পথ ধরে জেগে উঠে সিরিয়ার মানুষ। কিন্তু বন্দুকের আশ্রয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকবার নেশায় পাগল হয়ে উঠা নুসাইরি বাহিনী জনমতের প্রতি কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে চাপিয়ে দেয় অন্তহীন মহাযুদ্ধ।

২০১১ সালের শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সহিংস আকার পাওয়ার পর বর্তমানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রূপ নিয়েছে। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ লাখে। ১ কোটি মানুষ গৃহহীন। তিন লাখ পালিয়ে গেছে তুরস্কে। বিভীষিকাময় এই যুদ্ধের আশুসমাপ্তির কোনো আভাস এখনো দেখা যাচ্ছে না। দেশটির

CamScanner

অভ্যন্তরীণ অবস্থা সবচে মর্মান্তিক। সেখানে মৌলিক মানবিক বিপর্যয়ের শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে পৌঁছাও কষ্টসাধ্য। নুসাইরি বাহিনী ওইসব অঞ্চল ক্র্যাকডাউন (বাইর থেকে অবরোধ) করে রেখেছে বলে জানিয়েছে *সেভ দ্য চিলড্রেন*। ত্রাণসংস্থাকেও প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

রাজধানী দামেশকের ১২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী দারা শহরের একটি স্কুলের দেয়ালে বাসার বিরোধী স্লোগান লেখায় কয়েকজন তরুণকে আটক করে দেশটির 'নিরাপত্তা বাহিনী'। দেয়ালের গ্রাফিটি[১] ছিল- 'তিউনিসিয়া ও মিসরের পর সিরিয়ার বাসার হবেন পরবর্তী আরব নেতা যাকে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হবে'। সিরিয়ার বিপ্লব ও বর্তমান যুদ্ধের সূচনা এই সামান্য দেয়াল-লিখনকে কেন্দ্র করে। 'নিরাপত্তা বাহিনীর' হাতে নির্মম পীড়নে ছাত্রদের নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে গণমানুষের ক্ষোভ আর বাঁধ মানতে চায়নি। সিরিয়ার শহরে-নগরে শুরু হয় গণ-প্রতিবাদ, বিক্ষুব্ধ আন্দোলন। সময় যতো অতিবাহিত হয়েছে, জোরালো হয়েছে প্রতিবাদ। জান্তা যতোটুকু নির্মম হয়েছে, ততো পরিস্ফুটিত হয়েছে মানুষের হৃদয়ের লুক্কায়িত ক্রোধ-ক্ষোভ-ঘৃণা। আর এখন, শান্তিপূর্ণ এই গণবিক্ষোভই রূপ নিয়েছে ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে।

ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ-সময়ের সিরিয়া ধীরে ধীরে মধ্যপ্রাচ্যের আফগানিস্তান হয়ে উঠছে। আশির দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের পর মুক্তিকামী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বেশ কিছু দল গঠিত হয়। দেশটির নিকট প্রতিবেশী পাকিস্তান তাদেরকে অর্থ-অস্ত্র ও প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য লজিস্টিক প্রদান করে। এভাবে বিশ্বের দুটি পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তির দ্বন্দ্বে পরিণত হয় ভূখণ্ডটি। শেষের দিকে এসে *সিআইএ* মুজাহিদদের 'সহায়তা' দেয় বলে পশ্চিমা মিডিয়ার দাবি। ওই সময় পশ্চিমা গণমাধ্যমে মুজাহিদদেরকে 'মুক্তিযোদ্ধা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। দশক ধরে চলা এই যুদ্ধে ১৪ লাখ আফগান নিহত হন। গৃহহীন ও বাস্তুচ্যুত

---

১ আর্ট করে লেখা।

হন আরো কয়েক লাখ। বিপরীতে দখলদার রুশ ফেডারেশন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। রাশিয়ার ভাঙনে আমেরিকা হয়ে উঠে বিশ্বের একক পরাশক্তি। যদিও সোভিয়েতের পঁচে যাওয়া শব থেকে বেরিয়ে এই সময়ের রাশিয়া একই খেলা খেলতে চাইছে সিরিয়ায়। ঘনিষ্ঠ মিত্র নুসাইরি বাহিনীকে বিপুল মারণাস্ত্র সরবরাহ করেছে রুশ সরকার। এসব অস্ত্রের মধ্যে আছে, ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য এস-৩০০ মডেলের ক্ষেপণাস্ত্রও। সিরিয়ার তরতুস বন্দরে ক্রুসেডার রাশিয়ার শক্তিশালী নৌ-ঘাঁটির পাশাপাশি কৃষ্ণ সাগরে মোতায়েন আছে অত্যাধুনিক নৌবহর। খুনী বাশারের পাশে সর্বশক্তি নিয়ে একাত্ম হয়েছে সগোত্রীয় শিয়া ইরান। দেশটিতে গণহত্যা ও দমন-পীড়নের সঙ্গে ইরানিরা শুরু থেকেই সম্পৃক্ত। অর্থ-অস্ত্র ও জনবল দিয়ে নুসাইরিদেরকে সর্বাত্মক সহায়তায় ইরানের কার্পণ্য নেই। আছে ইরানি প্রক্সিবাহিনী *হিজবুল্লাহর* লেবাননি জঙ্গিরাও। বাশারের সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এই ত্রি-শক্তি বর্বরতম গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে সিরিয়ার মুসলমানদের উপর। *হিজবুল্লাহ* নেতা নসরুল্লাহ বলেছে, 'সিরিয়াকে সুন্নি 'চরমপন্থীদের' কাছে পরাস্ত হতে দেওয়া হবে না।' নুসাইরি শিয়াদের শাসন-ক্ষমতা সুসংহত করতে বিশ্বের সমস্ত শিয়াগোষ্ঠী সিরিয়ায় তাদের সর্বোচ্চ জনবল ও অন্যান্য মারণাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে।

বিপুল সমরাস্ত্র, বিরাট জনশক্তি ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর বিপরীতে সিরিয়ায় মুক্তিকামী মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি গ্রুপ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এই দলগুলোর মধ্যে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'নুসরা ফ্রন্ট'কে সবচে কৌশলী ও শক্তিমান মনে করা হয়। পাশ্চাত্যপন্থী ফ্রি সিরিয়ান আর্মি কোয়ালিশন, গণতান্ত্রিক ও সালাফি কিছু দলও সক্রিয় আছে। এছাড়া *দোহা* ও *আস্তানায়* গোলটেবিলের আয়োজন এবং গণমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে 'দায়িত্ব' পালন করবার মতো লোকের উপস্থিতিও রয়েছে।

সিরিয়ার নিকট প্রতিবেশী দেশ- লেবানন, জর্দান ও ইসরঈল। দেশটির গোলান মালভূমি ইসরঈলের দখলে। ১৯৬৭ সালের ছয়দিনের আরব-ইসরঈল যুদ্ধে ইহুদিরা ওই ভূ-খণ্ডের দখল নেয়। ইসরঈলের মুরুব্বিরা চায় না, পার্শ্ববর্তী

কোনো দেশের ক্ষমতার বাগডোর মুজাহিদীনের হাতে পড়ুক। এই চতুর্মুখী সংকট ও ষড়যন্ত্রের মুখেও বিপুল পরাক্রমে মোকাবেলা চালিয়ে যাচ্ছেন সিরিয়ার মুক্তিকামী মানুষ। কুশায়েরে সাম্প্রতিক লড়াইয়ে জনৈক হিজবুল্লাহ সন্ত্রাসীর লাশের সামনে দাঁড়িয়ে একজন প্রতিরোধ যোদ্ধা বলেন, তাঁরা 'ইরান, রাশিয়া ও শয়তানের' বিরুদ্ধে লড়ছেন এবং তা গোটা বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চান।



ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী সেনা ও সাঁজোয়া। মানবিজ, সিরিয়া, ২৪ জুন, ২০১৮-আপডেট। ছবি : ডিফেন্স ওয়ান।

বিপ্লবীদের ঐক্যমতে পৌঁছাতে ব্যর্থতা এবং অব্যাহত আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র সিরিয় সংকট নিষ্পত্তির প্রধান অন্তরায়। বিদ্রোহীদেরকে অস্ত্রসহায়তা দেওয়া হবে কি হবে না- এ নিয়ে ইউরোপিয় ইউনিয়নের নেতারা দ্বিধাবিভক্ত। সিরিয়ার উপর ইইউ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ২০১১ সালে। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাশিয়া, ইরান ও চায়না থেকে সমরাস্ত্র হাসিলে নুসাইরি বাহিনীর অসুবিধা নেই। অথচ নিষেধাজ্ঞার কারণে অস্ত্র সংগ্রহে সুবিধা করতে পারছে না বিপ্লবী গ্রুপগুলো। এই প্রেক্ষিতে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখবে কিনা তা নিয়ে ভাবনায় আছে ইইউ। ইইউ-র সদস্যদেশ অস্ট্রিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র ও সুইডেন মনে করে বিদ্রোহীদের এমন সহায়তা দিলে তা ইসরঈলের জন্য ভবিষ্যত হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বৃটেন ও ফ্রান্স মনে করে নিষেধাজ্ঞা আংশিক তুলে নিয়ে অনুগত গ্রুপগুলোকে অস্ত্র

সহায়তা দেওয়া যেতে পারে। নুসাইরিরা রাশিয়া ও ইরানের কাছ থেকে অস্ত্র হাসিল করে নির্বিঘ্নে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, বিপ্লবীদেরকে একই রকম সহায়তা দিলে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হতে পারত।

সিরিয়ায় *নো-ফ্লাই জোন* ঘোষণা করা হয়নি। রাশিয়া ও ইরানকে নিবৃত্ত করতে জাতিসংঘ ও কথিত 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়'ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়নি। যদিও মানবিক পীড়ন ও গণহত্যায় বিন্দুমাত্রও ক্ষান্তি নেই খুনী নুসাইরি বাহিনীর। এদিকে একটি অসমর্থিত সূত্রে সিরিয়ায় যুদ্ধে অংশ নিতে ইরানের 'রেভ্যুলেশনারি গার্ড বাহিনী' পাঠানোর কথা জানা গেছে। ইরান যে এই যুদ্ধে আগাগোড়া সম্পৃক্ত তা শুরু থেকেই পরিষ্কার। আঞ্চলিক শক্তির দ্বন্দ্বে এই যুদ্ধ বিভীষিকা গোটা অঞ্চলের স্থিতিহীনতার কারণ হয়ে উঠে কী-না তা নিয়ে বিশ্লেষকেরা শঙ্কিত। এ অঞ্চলের অন্য কয়েকটি শক্তি ইরান-তুরস্ক-সৌদি ও লেবানন যুদ্ধে জড়ালে এর পরিণতি হবে মারাত্মক। বর্তমানে আমেরিকা মৌখিকভাবে (এখন সরাসরি) ও রাশিয়া সিরিয়ার যুদ্ধে জড়ানোতে এই সংঘাত দশকব্যাপী স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল হচ্ছে। যুদ্ধ যতো দীর্ঘয়িত হবে, গণমানুষের ভাগ্য বিড়ম্বনাও ততো প্রলম্বিত হবে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও 'আন্তর্জাতিক মহলের' যৌথ উদ্যোগ হয়তো থামাতে পারবে গণহত্যা। রক্ষা পাবে একটি সমৃদ্ধশালী জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য। কিন্তু একসঙ্গে এতোগুলো শক্তির শুভবোধ উদয় হওয়ার সম্ভাবনা যে ক্ষীণ তা সবাই জানেন। অতএব সিরিয়ার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ মহাযুদ্ধে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনাই এখন পর্যন্ত প্রবল।

পুনশ্চ : বৃটিশ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হ্যালফোর্ড ম্যাককিন্ডার বলেছিলেন, 'যে সিরিয়া শাসন করবে, সে পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। যে মধ্যপ্রাচ্য শাসন করবে সে পুরো আফ্রিকা ও ইউরোপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।' আজকের সিরিয়ার দিকে তাকালে এমনটি সত্যি মনে হয়। যেন দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্র এখানে এসেছে নিজের শাসন বা পাপেট রেজিম প্রতিষ্ঠা করতে। সিরিয়ায় ২০১১ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষ নিহত হয়েছে। বাসার আল-আসাদ ও তার বাবার হাতে সিরিয়ার মানুষ দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে জুলুমের শিকার হয়। সুন্নি মুসলিমদের উপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হয়। আরব

বসন্তের হাওয়া যখন সিরিয়ায় আগমন করে, তখন নিপীড়িত মানুষেরা ফুঁসে উঠে, প্রতিবাদ করে। সৌদি ও আরব আমিরাতের নিজস্ব এজেন্ডার জন্য তারা সুযোগ লুফে নেয় এবং প্রতিবাদে সর্বোচ্চ মদদ জোগায়। শিয়া বাসারের ডাকে লেবানন ও ইরান এগিয়ে আসে। এগিয়ে আসে আমেরিকা-ন্যাটো। সিরিয়ায় পাপেট সরকার বসানোর জন্য আমেরিকা আসে। দেশটিতে আমেরিকার রয়েছে অনেক স্বার্থ, যার মধ্যে অন্যতম জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ ও সিরিয়াসহ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব কমিয়ে আনা। গৃহযুদ্ধে তৈরি হয় শত শত দল। কিছু দল সৌদি ও আমেরিকার মদদে পরিচালিত হয়। কিছু দল স্বেচ্ছাসেবী ও গণতন্ত্রপন্থী, কিছু সংস্কারপন্থী। আর বড় দল ছিল ইসলামপন্থী দলগুলো। আইসিস ও জাবহাতুন নুসরা। পরে আসে রাশিয়া। ন্যাটোর হাত ধরে এবং কুর্দি ইস্যু নিয়ে আসে তুর্কি। এখানে যে যার মতো যখন ইচ্ছে এয়ার বোম্বিং শুরু করে। একপক্ষ এই শহর ধ্বংস করে তো আরেকপক্ষ অন্য শহর। আর গ্রাউন্ডে বিভিন্ন ফোর্সের মাঝে পারস্পরিক লড়াই ও যুদ্ধ চলে। অবস্থা এতো বেশি ঘোলাটে হয়, সাধারণ মানুষ আজো সিরিয়ায় কি হচ্ছে তা বুঝতে পারে না। রাশিয়ার মদদে বাসার শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং হাতছাড়া হয়ে যাওয়া শহরগুলো পুনর্দখল করে। ট্রাম্প সবাইকে অবাক করে দিয়ে সিরিয়া থেকে আমেরিকান সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। অবশ্য এখনো তা বাস্তবায়ন হয়নি। ক্রুসেডার মার্কিনিদের এরিয়াল বোম্বিং এখনো চলছে।

সম্প্রতি সিরিয়ায় তিনটি দেশ তৎপর রয়েছে। তুর্কি নিজ স্বার্থে কুর্দিদের দমন এবং সিরিয়ান উদ্বাস্তুদের স্থান করে দেওয়ার জন্য উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ায় অপারেশন শুরু করেছে। রাশিয়া সিরিয়ায় তার অবস্থান দিন দিন পাকাপোক্ত করছে। আর নতুন করে এসেছে ইসরঈল। কয়েক মাস ধরে ইসরঈল সিরিয়ায় এরিয়াল বোম্বিং করছে। গৃহযুদ্ধের শুরুতে সৌদি ও আরব আমিরাত যতোটা সক্রিয় ছিল এখন তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। এতো কিছুর মাঝেও নিঃসঙ্গ ইসলামপন্থীরা প্রতিরোধের ধারা দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রেখেছেন।

কী দিয়েছে বসন্ত-বিপ্লব?

(প্রসঙ্গ : বসন্ত বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া-ফলাফল)

আরববসন্ত যা দিয়েছে কেড়ে নিয়েছে তারচেও বেশি। এই বিপ্লবের ফল ও ফসল ঘরে তোলার চেয়ে এখন এর ধকল সামলাতেই আরব জনগোষ্ঠীর নাভিশ্বাস উঠছে। বসন্তবিপ্লব, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও সর্বশেষ আরববিশ্ব নিয়ে কিছু কথা।

উসমানি সাম্রাজ্যের পতন পরবর্তী মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে *বসন্তবিপ্লব* সবচে বিধ্বংসী ও বিরল ঘটনা। *ওরিয়েন্টালিজমে* সরল ও আনুগত্যশীল, নিষ্কর্মা ও দাসসুলভ আরবচরিত্রের যে উপস্থাপনা তার সঙ্গে এই আবহ ঠিক খাপ খাওয়ার মতো না। 'রবিউল আরাবি-আরব বসন্ত' নামে পরিচিত এই বিপ্লবের প্রেক্ষাপট ও পটভূমি নিয়ে নানা রকমের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। পশ্চাতে কারা আছে, বিপ্লবের ফল-ফসল শেষপর্যন্ত কার ঘরে উঠেছে, এসব নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বসন্তবিপ্লবে অনলাইন এক্টিভিস্টদের মাঝে সেক্যুলারদের প্রাধান্য থাকলেও মাঠের যুদ্ধে ইসলামপন্থীরা ছিল অধিক সক্রিয়। ২০১১ সালে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে *আল-কায়েদা* প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ডের পর পরই গণমানুষের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠে মধ্যপ্রাচ্য। শাসকের অপকর্ম নিয়ে দেয়াল-লিখন, 'নিরাপত্তা বাহিনী'র হাতে নিহত তরুণদের লাশ কাঁধে স্থানীয় মানুষের নজিরবিহীন প্রতিবাদ, তিউনিসিয়ার সিদি বুজিদ শহরে যুবক আজিজির আত্মহনন -বসন্ত বিপ্লবের সূচনার সূচনা। বিক্ষুব্ধ জনগণ শাসকের নিপীড়ন ও চোখরাঙানি উপেক্ষা করে একাট্টা হয় আন্দোলনে।

গণমানুষের উত্তাল জোয়ারে পরিবর্তন সূচিত হয় তিউনিসিয়া, মিসর, লিবিয়া ও ইয়েমেনে। সিরিয়ার ক্ষেত্রে গণআন্দোলন পরিণত হয় গণমুক্তিযুদ্ধে। অন্যদিকে গরিবের গৃহে 'গণতন্ত্র' ও 'মানবাধিকারের' যোগানদাতাদের আসল চেহারা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মতো দেশে তাকিয়ে উপলব্ধি করা যায়। ওইসব দেশে জনগণের দুঃসহ জীবনযাত্রা বলে দেয়, গণতন্ত্রের নৃশংসতা কীভাবে চাপা দেয় সময়ের বর্বরতা? আফগানিস্তানের শাসক (মূলত কাবুলের মেয়র) হামিদ কারজাই গণতন্ত্রের ভাষাটিও শেখবার সুযোগ পায় না। সেখানে পশ্চিমা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কপচানির সঙ্গে জনগণের দিনলিপি লেখা হয় দুঃসহ যাতনায়। অন্ধকারের এই পর্দা উন্মোচন করলে আরো দেখা যাবে কত তিক্ত সত্য লুকিয়ে রয়েছে 'বাকস্বাধীনতা' ও 'গণতন্ত্র চর্চার' অন্তরালে? মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্যের ভূমিকা আমরা দেখেছি। অতীতে মুসোলিনি, স্তালিনরা যেমনটা দেখিয়েছে, এসময়ের মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে সেই একই ইঁদুর-বিড়াল খেলা খেলছে পশ্চিমা ক্রুসেডাররা। এ অঞ্চলে তাদের পরিষ্কার মিশন এখন আর লুকানো-চাপানো কিছু নয়। এবং এরাই একসময় ঔপনিবেশিক আচরণ করেছিল এখানকার জনসাধারণের সঙ্গে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মানুষ অতীত ভুলে যায়।

তিউনিসিয়া; শুরু যেখানে

তিউনিসিয়া আরবদের নিকট 'মাগরেবুল ইসলামি' নামে পরিচিত। এক সময় এই অঞ্চলটি ফরাসি দখলদারীর অধীনে ছিল। ১৯৫৭ সালে উপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা পাওয়া তিউনিসদের দুর্ভাগ্যের শুরু *হাবিব বরগুইবার* ক্ষমতারোহণের মধ্য দিয়ে। তিউনিসিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট বরগুইবা দেশটি থেকে ইসলামকে নির্বাসিত করবার সবরকমের চেষ্টা চালায়। জনসম্মুখে নামাজ আদায়ে নিষেধাজ্ঞাসহ রমজানে প্রকাশ্যে খাওয়া-দাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। বরগুইবা নিজেকে *তিউনিসিয়ার কামাল আতাতুর্ক* পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করতো। ১৯৮৭ সালে স্মৃতিশক্তি লোপ পায় ইসলাম বিদ্বেষী এই স্বৈরাচারীর। এসময় বরগুইবার সহযোগী *বিন আলি* 'ট্রাংকুয়াল রেভ্যুলেশনের' মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতাসীন বিন আলি আগের আমলের চাইতেও বেশি নির্মমতা

দেখায়। যদিও এসময়ের তিউনিসিয়াকে 'স্থিতিশীলতা'র তকমা দেয় পশ্চিমারা। ফরাসি, জার্মান ও বৃটিশের কাছে বিন আলি ছিল সভ্য ইউরোপের 'বন্ধু'।

তিউনিস বিপ্লবের মহানায়ক মুহাম্মদ বুআজিজি ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর গায়ে আগুন দেন। আগুনে ঝলসে গেলেও তাৎক্ষণিক মারা যাননি তিনি। আঠারোদিন হাসপাতালে যন্ত্রণাকাতর থেকে ৪ জানুয়ারি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আজিজি। এই ঘটনায় রাস্তায় নামা গণমানুষের তীব্র আন্দোলনের মুখে ২০১১ সালের ১৪ জানুয়ারি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় তিন দশকের স্বৈরশাসক জয়নুল আবেদিন বিন আলি। বিন আলির পলায়ন, অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, নির্বাচনে ইসলামপন্থী *আন-নাহদার* বিজয়- তিউনিসিয়ায় আরব-বসন্তের পালাবদলে দ্রুত ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনার ধারাক্রম। (যদিও ২০১৬-তে এসে রশিদ ঘানুচির *আন-নাহদা* 'ইসলামপন্থা থেকে সরে আসার' ঘোষণা দিয়েছে। এব্যাপারে আগের নিবন্ধ- 'যে জলে আগুন জ্বলে'র টিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

লিবিয়া; দ্য ডিক্টেটর

লিবিয়ায় সরকারবিরোধীরা ২০১১ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে বিক্ষোভের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় ইন্টারনেটের বেতারে। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ইন্টারনেট ও বিদেশি প্রচারমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরে। কিন্তু সরকারের সর্বাত্মক চেষ্টার পরও শিক্ষিত তরুণদের মাঝে এধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, কর্নেল গাদ্দাফির দিন ফুরিয়েছে।

১৯৪২ সালে সিরতের কাছে মরুভূমিতে জন্ম গাদ্দাফির। আরব জাতীয়তাবাদী নেতা জামাল আব্দুন নাসেরের ভক্ত গাদ্দাফি ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকটের সময় ইসরঈলবিরোধী মিছিল-সমাবেশে যোগ দেয়। সামরিক একাডেমিতে পড়াকালীন রাজা প্রথম ইদ্রিসকে উৎখাতের পরিকল্পনা করেন তিনি। বৃটেন থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে ১৯৬৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর

রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজা প্রথম ইদ্রিসকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসেন ২৭ বছরের কর্নেল গাদ্দাফি। ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৭৭ সালে *জামাহিরিয়া* বা 'জনগণের রাষ্ট্র' নামে এক অদ্ভূত পদ্ধতি চালু করেন তিনি। এর অর্থ, দেশজুড়ে গঠিত নাগরিক কমিটির কাছে থাকবে দেশের ক্ষমতা (অনেকটা বাংলাদেশে অধুনালুপ্ত 'গ্রাম-সরকারের' মতো)। কাগজে-কলমে গাদ্দাফির নিজের কোনো পদ ছিল না। নিজেকে তিনি পরিচয় দিতেন বিপ্লবের নেতা হিসেবে। নব্বইয়ের দশকে তার লেখা সবুজ বইতে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিকল্প স্বদেশী একতন্ত্রের কথা প্রচার করেন গাদ্দাফি। লিবিয়ার ৪২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। আরববিশ্বে সবচে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকা রাষ্ট্রনায়ক গাদ্দাফি। তার পরের ব্যক্তি ওমানের সুলতান কাবুস। গাদ্দাফি ও তার পরিবারের সদস্যরা সীমাহীন ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও উপজাতীয় গোষ্ঠীনেতাদেরও একই অবস্থা ছিল।

গণআন্দোলন রুখতে গাদ্দাফি শুরু থেকে কঠোর ছিলেন। জনতার উপর ফাইটার প্লেন ও মেশিনগান দিয়ে বর্বরোচিত আক্রমণ চালায় দেশটির সেনাবাহিনী। বেনগাজিতে গাদ্দাফি সেনাদের নির্বিচার গণহত্যা প্রস্তুতির প্রাক্কালে জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রথমে 'নো ফ্লাই জোন' ঘোষণা করে পশ্চিমাবিশ্ব। বিদ্রোহীদের মোকাবেলায় গাদ্দাফি সেনাদের মূলশক্তি ছিল যুদ্ধবিমান। *নো ফ্লাই জোন* গঠন ও গাদ্দাফির সেনা-অবস্থানের উপর ন্যাটোর সীমিতমাত্রায় হামলার ফলে ওই বিমানশক্তি অচল হয়ে যায়। এরপর কাতার ও সৌদির মধ্যস্থতায় ন্যাটোবাহিনী সরাসরি অভিযানে অংশ নেয়। গণমানুষকে জুলুম থেকে মুক্ত করার চাইতে তেলভাণ্ডারের দখল নিতে পশ্চিমাদের আগ্রহ ছিল বেশি। অন্যদিকে বেনগাজি ছিল *আল-কায়েদার* প্রথম সারির বেশ কিছু নেতার আবাসভূমি। আবু ইয়াহইয়া আল-লিবি, আবু মুয়াবিয়া, আবু আনাস ও আবু ফারাজ আল-লিবির মতো শীর্ষস্থানীয় বহু নেতার জন্মভূমি লিবিয়ায় একটি স্বাধীন ও অবাধ ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বেনগাজি হতে পারতো মৌলবাদীদের 'জিহাদ মিশনের' আরেকটি আফগানিস্তান।

'তেল' ও 'ইসলামপন্থা'কে সামনে রেখে পশ্চিমারা লিবিয়ায় সামরিক অভিযানের ঝুঁকি নিয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। যদিও বুড়ো দানব গাদ্দাফিকে সহজে পরাভূত করা গেছে, কিন্তু বেনগাজিতে মার্কিন গোয়েন্দা কনস্যুলেটে হামলা ও ইসলামপন্থীদের সামরিক তৎপরতা পশ্চিমাদের দুশ্চিন্তাকে বাস্তব করে তোলে। গাদ্দাফি বিরোধী লিবিয়া রেভ্যুলেশনে প্রায় দশ হাজার মানুষ নিহত হয়। (আগের প্রবন্ধের টিকায় সর্বশেষ পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে)।

মিসর; অন্ধকারের অচলায়তন

মিসরে কয়েক দশকের অচলায়তন ভেঙে গণমানুষ জেগে উঠেছিল প্রতিবাদ-বিক্ষোভে। শুরুটা সেক্যুলারদের মাধ্যমে হলেও সৌদি সমর্থিত সালাফি ও নিপীড়িত ইখওয়ানিরা ছিল বিপ্লবের পুরাভাগে। প্রথমদিকে হোসনি মোবারককে সরিয়ে দিতে পশ্চিমারা দ্বিধান্বিত ছিল। মিসরের বিপ্লবে সৌদি উৎসাহজুড়ে ছিল সালাফিজিম। অন্যদিকে সেক্যুলাররা চেয়েছে মোবারককে হটিয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ মিসর, যদিও তাদের জনসমর্থন ছিল ২ শতাংশেরও নিচে। ইখওয়ানিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। টানা তিন সপ্তাহর বিপ্লব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হোসনি মোবারককে হঠানো সম্ভব হলেও শুরুতে এই বিপ্লবের ফল-ফসল ত্রিপক্ষের কারো ঘরেই উঠেনি। সেনাসমর্থিত অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে স্বল্পসময়ে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও তা নিয়ে সৃষ্টি হয় অনিশ্চয়তার দোলাচাল। ফলে জনগণ বাধ্য হয়ে আবারো রাস্তায় নেমে আসে এবং শেষপর্যন্ত বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

মিসরের নির্বাচনে সেক্যুলারদের ভরাডুবি ও সালাফিদের সামান্য সফলতা দেখা গেলেও ইখওয়ানিরা ছিল নাগালের বাইরে। প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক দল গঠন করে নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী ইখওয়ানিরা সালাফিদের নিয়ে জোট গঠন করে। প্রশাসনিক সংস্কার ও অন্যান্য ইস্যুতে মতভিন্নতার ফলে মুরসি নেতৃত্বাধীন সরকারকে অসহযোগিতা করে এই জোট। ইসরঈলের প্রতিবেশী ভৌগলিক ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মিসরে মৌলবাদী শক্তির ক্ষমতারোহণ পশ্চিমা ও সেক্যুলার শক্তির জন্যও ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে স্বৈরতান্ত্রিক সৌদি রাজ-রাজড়ারাও দুশ্চিন্তায় পড়েন। কেননা একবার এই অঞ্চলে মৌলবাদ ঘাঁটি গেড়ে বসলে তার প্রভাব অবিশ্যম্ভাবীভাবে অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়বে। এসব কারণে এই শক্তিচতুষ্টয় (সৌদি, ইসরঈল, পশ্চিমা ও সেক্যুলার) মিলিতভাবে মুরসি সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে। ফলে আবারো তাহরির স্কয়ারের ভূমিকা দেখা যায় এবং 'তামাররদ-প্রতিবিপ্লবের' মাধ্যমে সেক্যুলার ও সালাফিরা মিলিত হয়ে আমেরিকার গৃহপালিত সেনাদেরকে ক্ষমতায় পুনঃঅধিষ্ঠিত করে।

মিসরিয় সেনাবাহিনীকে দেওয়া ওয়াশিংটনের বাৎসরিক সাহায্যের পরিমাণ ১৩০ কোটি ডলার। এই সেনারা বরাবরের মতো যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত থেকেছে। মিসরের ক্ষেত্রে ইসলামপন্থীদের গুরুতর ভুল ছিল, বিপ্লবের ফল-ফসল প্রত্যক্ষ ও কর্তৃত্বপূর্ণ উপায়ে ঘরে না তুলে গণতন্ত্রের পাতানো ফাঁদে পা দেওয়া।

ইয়েমেন; আল-কায়েদার দ্বিতীয় উত্থান

আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে শীর্ষস্থানীয় বেশ কিছু নেতাকে হারিয়ে আল-কায়েদা যখন কিছুটা বেকায়দায়, ওই সময় শায়েখ আনওয়ার আল-আওলাকির মতো আলেমদের তত্ত্বাধানে ইয়েমেনে সংগঠনটি সুসংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। 'আল-কায়েদা জিহাদ ইন এ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা' আবিয়ান প্রদেশসহ ইয়েমেনের একটি বড়ো অংশের দখল নিয়ে শরিয়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। পাশ্চাত্যের পুতুল সেক্যুলার আলি আবদুল্লাহ সালেহর সরকার তাদের মোকাবেলায় সমর্থ ছিল না। ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল ফোর্স এই নতুন ঝড় মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছিল। আরব বসন্তের জেরে সৃষ্ট প্রতিবাদ ইয়েমেনের রাজধানী সান'আতে ছড়িয়ে দেওয়া। দুর্নীতিবাজ এই স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ মানুষকে উস্কে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল আল-কায়েদার সশস্ত্র প্রতিরোধকে খাটো করে দেখানো। যদিও অহিংস বিপ্লবের গল্পগুলো হালে পানি পায়নি।

সিরিয়া; যুদ্ধের নিয়তি

সিরিয়ায় শুরুতে আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু নুসাইরি বাসারের অব্যাহত দমন-পীড়নে মানুষ অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হয়। গণমানুষের প্রতিবাদ আন্দোলন গণমুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ার আগে ১৫ হাজার মানুষ নিহত হয়। সিরিয়ার সঙ্গে ইরাকের রয়েছে ওপেন বর্ডার। এখানকার মুসলিমদের দুর্দশায় সাহায্যের হাত বাড়ায় ইরাকের মুজাহেদিন। সম্ভাব্য সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসে 'আল-কায়েদা ইন দ্য ইসলামিক মাগরেব'। স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক গড়ে উঠে ভিন্ন ভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপ। যে যার মতো করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। পরে অবশ্য সেক্যুলার ও গণতন্ত্রকামীদের বিভিন্ন গ্রুপ মিলে গঠিত হয় *এসএনসি* বা 'সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল'। *প্রবাসী সিরিয়া সরকার* গঠন ও *ফ্রি সিরিয়ান আর্মি* (এফএসএ) নামে পশ্চিমা মদদপুষ্ট সশস্ত্র কার্যক্রম শুরু করে এই কাউন্সিল। অন্যদিকে ইরানি আগ্রাসন প্রতিরোধে সৌদি ও কাতার দৃশ্যপটে আর্বিভূত হলে দেশ দুটির তত্ত্বাবধানে বেশ কটি ইসলামপন্থী গ্রুপের উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে 'জাবহাতুল ইসলামিয়া' (ইসলামিক ফ্রন্ট) সৌদি-সালাফি ধ্যানধারণা পোষণ করে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমর অভিজ্ঞতায় পুষ্ট আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট দলগুলো যুদ্ধে চমকপ্রদ ভূমিকা রাখছে। সিরিয়াকেন্দ্রিক হলেও *বৈশ্বিক জিহাদ* (গ্লোবাল জিহাদ) ধারণার সঙ্গে তাদের কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

কী দিয়েছে আরব বসন্ত?

লিবিয়ায় নিহত হয়েছে দশহাজার মানুষ। সেখানে কার্যত কোনো সরকারব্যবস্থা নেই। বেনগাজিতে ইসলামপন্থীদের উপর নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে ক্রুসেডার আমেরিকার নেভাল ফোর্স। ত্রিপোলি বাইরের কিছু অংশে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমাদের অনুগত *খালিফা হাফতারের বাহিনী* দেশের তেলভাণ্ডার দখলে নিতে বেশি উৎসাহী। তিউনিসিয়ার ইসলামপন্থীরা পশ্চিমা চাপে নতিস্বীকার করে অন্তবর্তী সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। যদিও মানুষ আগের চেয়ে কিছুটা ভালো আছে এবং দেশটিতে ইসলামের প্রতি নব-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মিসরের গণবিপ্লবে শুরুতে নিহত হয় ৬৪০জন। ওই সংখ্যা

পরে সাত হাজার ছাড়িয়ে যায়। ইসলাপন্থীদেরকে গণগ্রেফতারসহ ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও দলটির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের পাতানো বিচারের মুখোমুখী করা হয়। সেনাপ্রধান জেনারেল সিসি রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। ইয়েমেনে শাসক পরিবর্তন ছাড়া আরব বসন্তের কার্যত কোনো ফল দেখা যায়নি। ইয়েমেনি আল-কায়েদা আগের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে। অন্যদিকে সিরিয়া রেভ্যুলেশনে এপর্যন্ত নিহত হয়েছে দুই লাখ মানুষ (২০১৪ সালের হিসেবে)। ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তু ৯০ লাখের ওপরে। যুদ্ধ-বিভীষিকায় পুরো দেশ বিধ্বস্ত। শিয়া ইরান, হিজবুল্লাহ ও বাসারের বাহিনীর বিরুদ্ধে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি, সালাফি জোট ও আল-কায়েদা সমর্থিত জাবহাতুন নুসরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্তহীন এই যুদ্ধ কবে শেষ হবে, এই প্রশ্নের জবাব আপাতত কারো জানা নেই। আরব বসন্ত থেকে সৃষ্ট বিপ্লবে সবচে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি দেশ- লিবিয়া ও সিরিয়া। মিসরে সেনাপ্রধান সিসির ক্ষমতারোহণ এবং ইসলামপন্থীদের উপর দমনপীড়ন সেখানে সিরিয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে কিনা সে সংশয় রয়ে গেছে। তবে ঘটনা যাই হোক বসন্ত বিপ্লব নিয়ে ধোয়াশা এখনো কাটেনি। বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল-ফসলও কোনো পক্ষই ঘরে তুলতে পারেনি। ইসলামপন্থীরা যদিও নিপীড়নের শিকার, কিন্তু মরুর বুকে উঠা খেলাফত প্রতিষ্ঠার এই নতুন ঝড়-স্ফুলিঙ্গ কুফুরিশক্তি রুখতে পারবে না এমন মনে করার যথেষ্ট শক্তিশালী কারণ রয়েছে। হাদিসের ভাষ্য ও চলতি ঘটনাপ্রবাহও সেদিকেই এগুচ্ছে।

পুনশ্চ : আরব বসন্তের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বাইরে এতোটুকু বলা যায়, এটি পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করে দিয়েছে। আজ মিসর, কাল লিবিয়া, পরশু সিরিয়া, ইরাক বা ইয়েমেন -সর্বত্র একই অবস্থা। যেন একটি দেশের অবস্থা আরেকটি দেশের প্রতিচ্ছবি। একই ঘটনা, একই কাহিনী, শুধু স্থান ও চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন। স্বৈরশাসনের পতন করতে গিয়ে জেগে উঠেছে নতুন স্বৈরাচার। কখনো সামরিক শক্তির মাধ্যমে, কখনো মিথ্যা গণতন্ত্রের সাহায্যে। এদিকে চলছে আলাদা আলাদা জোটবাজির প্রক্রিয়া। তুর্কি-কাতার, সৌদি-মিসর-আরব আমিরাত। সবার স্বার্থ ভিন্ন। আবার পরস্পর তারা বিচ্ছিন্ন। আছে লেবানন-সিরিয়া-ইরান-ইয়েমেনে আধিপত্য বিস্তারকারী

শিয়াগোষ্ঠী। এদিকে বৈদেশিক শক্তিগুলো খাবলে খাবলে খাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের একেক অঞ্চল। তবে আশার বাণী হলো, প্রায় সবদেশেই সালাফদের অনুসারী ও অনুগামী মুমিনদের উত্থান ঘটছে। এর পেছনেও অবশ্য আরব বসন্তের পরোক্ষ অবদান রয়েছে। স্ট্যাবল রাষ্ট্রে গণউত্থান হতে পারে না, সেখানে সুযোগ থাকে অনেক কম। কিন্তু রাষ্ট্র অস্থিতিশীল হয়ে পড়লে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং তখনই মানুষের মধ্যে জাগরণ দেখা দেয়। মধ্যপ্রাচ্যেও তাই হয়েছে ও হচ্ছে। আরব বসন্তের সাফল্যের জায়গাই এটি, যা আরব জনগণের অন্তরের ভয়ের দেয়ালকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ফলে মানুষকে আর আগের মতো ভয়ের চাদরে মুড়িয়ে রাখা যাচ্ছে না। জুলুমের বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বলার, আওয়াজ উঠানোর সাহস তারা দেখাতে পারছে। আজকের মধ্যপ্রাচ্যের এই জাগরণ, গণআন্দোলন ও সশস্ত্র সংঘাত যদিও রক্তে রঞ্জিত ও বেদনাবিধূর, তাও আমরা আশাবাদী, ইনশাআল্লাহ এই গণজোয়ার, মানুষের এই নবউদ্দীপনা জালেম শক্তিগুলোর জুলুমের ভিতকে স্থায়ীভাবে গুড়িয়ে দিয়ে ফিরিয়ে আনবে নতুন সেই সুহাসিনী ভোর, খেলাফত আলা মানহাজিন নবুওয়াহ। বিইজনিল্লাহ!

লিবিয়া; মহাসমরের নতুন ফ্রন্ট

(প্রসঙ্গ : *লিবিয়ার গৃহযুদ্ধ ও চলমান অস্থিরতা*)

...কিছুদিন আগ পর্যন্ত ক্ষুদ্র প্রভাবের দেশ আরব আমিরাত ইসরঈলের এজেন্ডা বাস্তবায়নে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নিজ শক্তি ও প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টায় আছে। দেশটির শাসকেরা বেশ ক'বছর থেকে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ বিদ্বেষী ইসরঈল ও তার ঘনিষ্ঠ বলয়ের (ভারত) সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিমা ষড়যন্ত্রে বিপর্যস্ত মধ্যপ্রাচ্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বিপজ্জনক দুটি দেশ সিরিয়া ও লিবিয়া। ২০১১ সালে শুরু হওয়া লিবিয়ার গৃহযুদ্ধ মারাত্মক ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যের স্থানীয় পাতি খেলুড়ে দেশগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা লিবিয়ার ধ্বংসাত্মক গৃহযুদ্ধকে অনিষ্পত্তিযোগ্য করে তুলেছে। চলমান এই দ্বন্দ্বে কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের পারস্পরিক শক্তি প্রদর্শন সংঘাতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। আরব আমিরাত এর আগে লিবিয়া, সিরিয়া এবং ইরাকে প্রক্সি যুদ্ধ চালালেও, বর্তমানে দেশটিতে সরাসরি হামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। লিবিয়ায় ছয় মাসের গণঅভ্যুত্থান ও গৃহযুদ্ধের পর ২০১১ সালে গাদ্দাফির একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে। একই বছরের অক্টোবরে প্রধান বিরোধী গ্রুপ ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল (এনটিসি) দেশটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্ত ও স্বাধীন বলে ঘোষণা করে লিবিয়াকে একটি 'বহুদলীয় গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। কিন্তু দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসক গাদ্দাফির পতন ও মৃত্যুর পরও দেশটিতে স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি। ২০১২ সালের জুলাইয়ে লিবিয়ায় ছয় দশকের মধ্যে প্রথম

পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আগস্টে *এনটিসি* নবনির্বাচিত জেনারেল *ন্যাশনাল কংগ্রেসের* কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। যদিও এই ফলাফল টেকসই হয়নি। বিপ্লব পরবর্তী লিবিয়ায় এ পর্যন্ত পাঁচটি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। কোনো সরকারই দেশকে স্থিতিশীল করতে পারেনি। বেশ কিছু মিলিশিয়া গ্রুপ দেশের বিভিন্ন এলাকায় নৈরাজ্য চালাচ্ছে। দেশটিতে সতের শ'র মতো মিলিশিয়া গ্রুপের উপস্থিতি জানা যায়। এদের প্রত্যেকের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। তবে বেশিরভাগই চায়, ক্ষমতা ও অর্থ। কথিত উদারপন্থী, আঞ্চলিক ও জাতিগোষ্ঠীগত এবং ইসলামপন্থী বিভিন্ন গ্রুপ এখানে রয়েছে। গাদ্দাফির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাজধানী ত্রিপলিতে বিবদমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকবার ভয়াবহ লড়াইয়ের ঘটনা ঘটে। বর্তমান লিবিয়া যেন একটি খোলা অস্ত্রের বাজার। চলমান এই সংঘাত অবসানে পশ্চিমা অথবা আরব লিগ ও আফ্রিকান ইউনিয়নের (এইউ) মতো আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর উল্লেখযোগ্য তৎপরতা নেই। পশ্চিমা বিশ্ব ও আরব লিগ সিরিয়া ও মিসর নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। গাদ্দাফিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ন্যাটো হামলার বিরোধিতাকারী আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রভাবও খুব বেশি নয়। দেশটিতে সক্রিয় একটি মিলিশিয়া গ্রুপের নেতা জেনারেল খলিফা হাফতার। তার নেতৃত্বাধীন মিলিশিয়া গ্রুপের নাম *লিবিয়া ন্যাশনাল আর্মি* (এলএনএ)। এই জেনারেল গাদ্দাফিকে ১৯৬৯ সালে ক্ষমতা দখলে সহায়তা করেন এবং ১৯৮০-এর দশকে শাদে লিবীয় সামরিক বাহিনীর অনুপ্রবেশে মূখ্য ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে গাদ্দাফির আস্থা হারিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নেওয়া হাফতার গণঅভ্যুত্থানের সময় লিবিয়ায় ফিরে পশ্চিমা মদদে গাদ্দাফির সাবেক অনুগতদের নিয়ে একটি মিলিশিয়া দল গঠন করেন। লিবিয়রা মনে করেন, দেশটির বর্তমান অস্থিতিশীলতার জন্য এই জেনারেলই দায়ী। তার প্রধান ঘাঁটি বেনগাজি।

নিউইয়র্ক টাইমসে আমিরাতি জঙ্গি যান থেকে লিবিয়ায় ইসলামপন্থীদের উপর হামলার ব্যাপারে রিপোর্ট প্রকাশিত পর আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় এব্যাপারে সংবাদ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। *এএফপির* সঙ্গে আলাপকালে ইসলামিপন্থী দলটির এক সদস্য জানিয়েছেন, ওই হামলা তাঁদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে চালানো হয়। ত্রিপোলি বিমানবন্দরকে 'জঙ্গিমুক্ত' করার কৌশল হিসেবে হামলা চালানো

হয়েছে বলে ধারণা বিশ্লেষকদের। হামলা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র জানত কিনা- এ ব্যাপারে মার্কিন প্রশাসনের কাছে জিজ্ঞেস করা হলে তারা কিছুই নিশ্চিত করেনি। মিসর ও আরব আমিরাতের কর্মকর্তারাও এ ব্যাপারে মন্তব্য করেননি।

গাদ্দাফি পরবর্তী বছরগুলোতে লিবিয়ার ভূ-রাজনীতিতে একের পর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটছে। এখন পর্যন্ত তিনটি বড় জোটের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে লিবিয়ার 'বৈধ সরকার' বলে আবদার করে। কাতার সমর্থিত জেনারেল ন্যাশনাল কংগ্রেস, জাতিসংঘ অনুমোদিত গভর্মেন্ট অব ন্যাশনাল অ্যাকর্ড এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি সমর্থিত জেনারেল হাফতারের তুবরুক ভিত্তিক অন্য একটি সরকার দেশটিতে সক্রিয় রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের দাবি, লিবিয়ার বৈধ প্রতিনিধিত্বকারী হওয়ার। যদিও বাস্তবে হাফতার বাহিনী ছাড়া কেউ দেশটির মোটে এক চতুর্থাংশ ভূমিরও অধিকারী নয়। মিসর হাফতারের নেতৃত্বাধীন লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে (এলএনএ) সমর্থন করে। অতীতে তুরস্কের সমর্থন পেয়েছে জেনারেল ন্যাশনাল কংগ্রেস। কাতার আগে থেকেই লিবিয়ার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এবং গাদ্দাফি যুগে ইসলামপন্থী বিরোধী দলের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। গাদ্দাফির পতনের পর লিবিয়ার স্থিতিশীল প্রক্রিয়ায় প্রভাবশালী আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিগুলোর হস্তক্ষেপে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন গোত্র ও মিলিশিয়া বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ-সংঘাতে একেকটি অঞ্চলে একেক বাহিনীর আধিপত্য দেখা দেয়। সর্বশেষ প্রধানত দুটি পক্ষের অধীনে লিবিয়া বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি পক্ষ জেনারেল ন্যাশনাল কংগ্রেস (জিএনসি) রাজধানী ত্রিপোলি, মিসরাতাসহ আশপাশের অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। আন্তর্জাতিকভাবে এটিকে 'বৈধ সরকার' মনে করা হয়। অন্য দিকে ২০১৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে *হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ* মিসর সীমান্তের তবরুক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে একটি সরকার গঠন করে। এ সরকারের কর্তৃত্ব স্বঘোষিত *এলএনএ* প্রধান খলিফা হাফতারের কাছে চলে যায়। ৭৫ বছর বয়সী এ জেনারেলকে সবধরনের সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা দেয় মিসর, সৌদি ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ব্লুমবার্গ পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্লেষণে বলা হয়, 'নেপথ্যে আমেরিকান সমর্থনও রয়েছে হাফতার বাহিনীর প্রতি, যদিও প্রকাশ্য মার্কিন সমর্থন ব্যক্ত হয় ত্রিপোলির জাতিসংঘ স্বীকৃত সরকারের প্রতি।'

অন্যদিকে জেনারেল হাফতার আগাগোড়া আমেরিকান পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেও একাধিকবার রাশিয়া সফর করে পুতিনকে রুশ ঘাঁটি ও তেলক্ষেত্রের সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করে সমর্থন লাভের চেষ্টা করে খানিকটা সাড়াও পেয়েছেন।

লিবিয়ার ন্যাশনাল আর্মির (এলএনএ) সঙ্গে সমন্বয় সাধন ও 'ইসলামি চরমপন্থীদের' উৎখাত করার জন্য ২০১৪ সালের মে মাসে হাফতার একটি সামরিক ক্যাম্পেইন শুরু করেন। এটি কাতার-সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। লিবিয়ার সশস্ত্র সংঘাতে তখন প্রতিটি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহীদের পক্ষ নেয়। এসময় বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরব তাদের রাষ্ট্রদূতদের কাতারের রাজধানী দোহা থেকে ফিরিয়ে নেয়। হাফতারের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধির মূলে ছিল মিসর ও আমিরাতি যুদ্ধবিমান। শুরুতে গোপন রাখা হলেও ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিসর প্রকাশ্যেই লিবিয়ায় ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে বিমান আগ্রাসন শুরু করে। মিসর, সৌদি ও আমিরাতের মতে, 'ইসলামি জঙ্গিদের দমন করা না গেলে খুব শিগগিরই তারা এ অঞ্চলের জন্য হুমকি হয়ে উঠবে!'

জাতিসংঘের ভাষ্যে বলা হয়েছে, হাফতারের মিলিশিয়ারা সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিমান, সামরিক যান ও অন্যান্য সরবরাহ পাচ্ছে। মিলিশিয়া নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিমান ঘাঁটি নির্মাণে দেশটি সহায়তা দিয়েছে। যদিও হাফতারের শক্তি ক্রমবর্ধমান না হয়ে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি রাজধানী দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার মধ্য দিয়ে সেটি আবারো ফুটে উঠেছে।

লিবিয়ায় আঞ্চলিক শক্তিগুলোর স্বার্থ

আঙ্কারার লিবীয় যুদ্ধে জড়িত হওয়া আংশিকভাবে বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেছিলেন, লিবিয়ায় তাদের প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের নির্মাণ চুক্তি বাস্তবায়নাধীন। দেশটি ভূমধ্যসাগরে এর কৌশলগত অবস্থানকে আরো জোরদার করতে চায়। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মিসর ও আমিরাত রাজনৈতিক ইসলামকে ধ্বংস ও কোণঠাসা করার যে চেষ্টা করছে তাও প্রতিহত করতে চায় তুরস্ক।

প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে আলজেরিয়ার সঙ্গে হাফতার সমর্থক দেশগুলোর সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। এরপরও আলজেরিয়ার নিজস্ব কিছু স্বার্থের গ্যারান্টি দিয়ে হাফতার একধরনের সহাবস্থানের সম্পর্ক তৈরি করেছেন দেশটির দক্ষিণাঞ্চল দখল করার ক্ষেত্রে। প্রতিবেশী তিউনিশিয়া অবশ্য হাফতারের দখলাভিযানকে সমর্থন করেনি। ত্রিপোলি সরকারের পক্ষে তুরস্ক ও কাতারের শক্ত অবস্থান রয়েছে। এ দেশ দুটি এবং ইতালির সমর্থন না থাকলে ত্রিপোলি সরকারের পক্ষে হাফতার বাহিনীকে প্রতিহত করা কঠিন হয়ে দাঁড়াত।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির সাম্প্রতিক মেরুকরণে সৌদি আরব, মিসর ও আমিরাত এ অঞ্চলে সংগঠিত প্রতিটি ঘটনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রাখছে। এই ত্রিশক্তির অন্তরালে আছে ইহূদি ইসরঈল। সৌদি নেতৃত্বাধীন আরব দেশগুলো তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব বহাল রাখতে ইসরঈলের সঙ্গে নতুন সখ্যতা গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে ইসরঈলি এজেন্ডা হলো, আরব ও মুসলিম শক্তিগুলোকে বিবদমান রেখে সব আরব দেশকে নিরাপত্তার জন্য তার ওপর নির্ভরশীল করে তোলা। যদিও ইসরঈল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে বিবদমান শক্তিগুলোর কাউকেই পুরোপুরি বিজয়ী বা পুরোপুরি পরাজিত দেখতে চায় না। মিসরে আরব বসন্তের সময় মুসলিম ব্রাদারহুড ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক ইসলামি শক্তির ক্ষমতায় যাওয়ার পথে বড়সড়ো বাধা তৈরি করেনি এই দুটি দেশ; কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার এক বছরের মাথায় সামরিক অভ্যুত্থানে মদদ দিয়ে ব্রাদারহুডের পুরো শক্তিকে নির্মূল করার কাজে জেনারেল সিসিকে মদদ দেওয়া হয়। সিসির শক্তি যাতে কোনো বাধার মধ্যে না পড়ে তার জন্য মিসরের প্রতিবেশী সুদানে ব্রাদারহুডের প্রতি সহানুভূতিশীল ওমর আল-বশিরের সরকারের পতন ঘটানো হয়। ওমর আল-বশিরের বিদায়ের সঙ্গে একাধিক সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা দেখিয়ে সেনা প্রতিষ্ঠান থেকে বহুসংখ্যক পদস্থ কর্মকর্তাকে বিদায় করা হয়; কিন্তু রাজপথে আন্দোলনকারী শক্তি বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন অব্যাহত রাখায় সুদানে শেষপর্যন্ত রাবা স্কোয়ারের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে সিসি মার্কা সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। একধরনের ভারসাম্য সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে।

নেপথ্যে ইসরঈল

লিবিয়ায় জেনারেল হাফতারের প্রকল্প সৌদি-আমিরাত-মিসর-ইসরঈল নতুন বলয়ের পরিকল্পনার একটি অংশ। সুদানের মতো সেখানে প্রকল্পের আংশিক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। পাল্টা শক্তির হস্তক্ষেপে রাজধানী দখলের সামরিক অভিযান মাঝামাঝি পৌঁছে আটকে গেছে। ইয়েমেন, সুদান ও লিবিয়ার সংঘাতে আরব আমিরাত মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। কিছুদিন আগ পর্যন্ত ক্ষুদ্র প্রভাবের দেশ আরব আমিরাত ইসরঈলের এজেন্ডা বাস্তবায়নে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নিজ শক্তি ও প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টায় আছে। দেশটির শাসকেরা বেশ ক'বছর থেকে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ বিদ্বেষী ইসরঈল ও তার ঘনিষ্ঠ বলয়ের (ভারত) সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ থেকে বেরিয়ে এসে জেরুসালেমকে ইসরঈলের রাজধানী ঘোষণা এবং পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি স্থাপনের বৈধতাদানের ক্ষেত্রে অন্তরালে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে এই আমিরাত। পুরস্কার স্বরূপ, আমিরাতের নিরাপত্তা বিধানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ইসরঈলি প্রতিষ্ঠানকে। যদিও দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক এখনো নেই মর্মে দেখানো হয়।

জনগণের মতের উল্টোপথে হেঁটে কেবল ইসরঈলের শক্তির ওপর ভর করে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় কতটা এগোতে পারবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও তার মিত্র রাজতান্ত্রিক দেশগুলো- তাতে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। খলিফা হাফতারের আক্রমণাত্মক অভিযানের এখনকার ব্যর্থতা সেই সন্দেহকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। সেই সঙ্গে বর্তমান লিবিয়ায় শান্তির আশাও সুদূর পরাহত। মানুষের জীবন এখানে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। জনগণের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। গ্লোবাল জিহাদের মানহাজে পরিচালিত বেনগাজিভিত্তিক *মুজাহিদীন শুরা কাউন্সিল দিরনা* সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে তৎপর হলেও পশ্চিমা ক্রুসেডারদের চক্রান্ত এখানে অনেক বেশি বিস্তৃত।

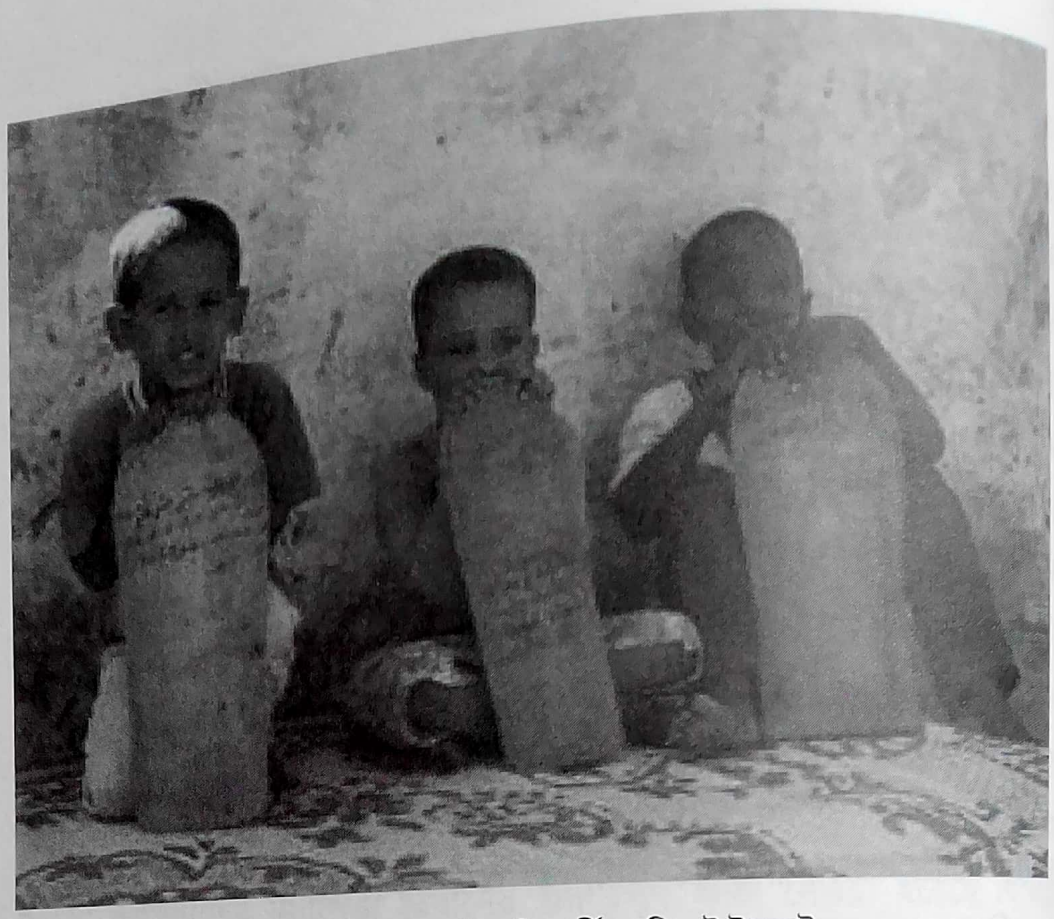
(-আমেরিকান মিডিয়া ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ ফেলো জোসেফ হ্যামন্ডের নিবন্ধ অবলম্বনে এবং আরটিএন ও ইন্টারনেট থেকে সংক্ষেপিত)

কাঠে খোদাই বর্ণমালা!

(প্রসঙ্গ : *মোরিতানিয়ার চালচিত্র*)

... প্রিন্স আল-ওয়ালিদ ভবন নির্মাণ করে কিলোমিটার উপরে উঠে যাচ্ছেন, অথচ মোরিতানিয়ার গ্রাম্য শিশুরা অপ্রতুল শিক্ষাসরঞ্জাম ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বঞ্চিত হচ্ছে ঐতিহ্যগত ইসলামি শিক্ষা থেকে।

মোরিতানিয়া পশ্চিম আফ্রিকার একটি উন্নয়নশীল মুসলিম দেশ। অর্ধশতাব্দী আগে ফরাসি দখলদারী থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে দেশটি। বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসরমান এই দেশের সর্বত্র আর্থিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত নয়। এখানে গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে। শহুরে নাগরিকেরা যখন বিশ্বায়নের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে, গ্রামের ছোট্ট শিশুটি শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতায় খোদাই কাঠের বর্ণমালায় শুরু করছে জীবনের মৌলিক পাঠ। আরববিশ্ব, পেট্রো ডলার ও বেহিসেবি আরবশেখদের হেরেমখানায় নর্তকী প্রতিপালন ও খেমটা নাচের বিপরীতে এধরনের অজস্র উদাহরণ আরব জনপদগুলোতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ইন্টারনেটের সার্চ ইঞ্জিনে 'মোরিতানিয়া এডুকেশন' লিখলে আপনি এ-বিষয়ক অসংখ্য চিত্র দেখতে পাবেন– ছোট ছোট বাচ্চারা কাঠের টুকরো দিয়ে *আলিফ, বা, তা* শিখছে। একদিকে পশ্চিমাদের ভল্টে অলস পড়ে থাকা আরবশেখদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের উৎস খুঁজে পাচ্ছে না! পেট্রো ডলারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে পশ্চিমের অর্থনীতি। আর ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে পড়ছে মুসলিমবিশ্বের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো। সামরিক শক্তির কথা না হয় নাই বললাম।



মোরিতানিয়ার শিশু শিক্ষার্থী। ছবি : ইন্টারনেট

মোরিতানিয়া মাগরেবিয় অঞ্চলের একটি দেশ। মাগরেব (*The Maghreb*) বলতে উত্তর আফ্রিকার যে অঞ্চলকে বোঝানো হয়, এর মধ্যে মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার ভৌগলিক বিস্তৃতি রয়েছে। ব্যাপক অর্থে লিবিয়া ও মোরিতানিয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। অতীতে 'মাগরেব' বলতে সাধারণত দেশ তিনটির যেসব অংশ সুউচ্চ অ্যাটলাস পর্বতের উত্তরে ও ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত সেগুলোকে বোঝানো হতো। ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ স্পেন, পর্তুগাল, সিসিলি দ্বীপ ও মাল্টা দ্বীপপুঞ্জকেও মাগরেবের অন্তর্ভুক্ত করেন। মাল্টা দ্বীপপুঞ্জে আরবি ভাষার মাগরেবিয় উপভাষা এখনো অন্যতম একটি ভাষা হিসেবে প্রচলিত। অ্যাটলাস পর্বতমালা ও সাহারা মরুভূমির কারণে মাগরেব অঞ্চলটি আফ্রিকার অন্যান্য অংশ থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন। জলবায়ু, ভূমি, অর্থনীতি ও ঐতিহাসিক দিক থেকে এটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে বেশি সম্পৃক্ত।

সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানরা বাইজেন্টাইন শহর কার্থেজ (বর্তমানে তিউনিসিয়ায় পড়েছে) এবং ৭১১ সাল নাগাদ স্থানীয় বার্বার জাতির বাধা অপসারণ করে মরক্কো পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হন। এসময় বার্বারদেরকে ইসলামে দীক্ষিত ও মুসলিম সেনাবাহিনীতে একীভূত করা হয়। আরবরা মিসরের পশ্চিমের এই অঞ্চলটিকে *মাগরেব* বা *আল-মাগরেবুল ইসলামি* বলে অবহিত করতেন। আরবি ভাষায় *মাগরেব* মানে- 'সূর্যের অস্তস্থল' বা 'পশ্চিম দিক'।

ঊনিশ শতকের শেষের দিকে ফরাসিরা উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকায় উপনিবেশিক আগ্রাসন শুরু করে। সেনেগাল নদী ধরে তারা মোরিতানিয়ায় প্রবেশ করে। ১৯২০ সাল নাগাদ মোরিতানিয়া ফরাসি উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯৪৬ সালে একে ফ্রান্সের একটি বহিঃস্থ প্রশাসনিক অঞ্চল বানানো হয়। ১৯৫৮ সালের ২৮ নভেম্বর মোরিতানিয়া নিজেকে ফরাসি ৫ম প্রজাতন্ত্রের অধীন 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করে। দুই বছর পর ১৯৬০ সালে দেশটি ফরাসি দখলদারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়। ১৯৬১ সালে জাতিসংঘে যোগদান এবং একই বছর *মোক্তার উলদ দাদ্দাহ* দেশটির প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬, ৭১ ও ৭৬ সালে তিনি পুনঃর্নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ষাটের দশকের শেষ ও সত্তুরের দশকের শুরুতে মোরিতানিয়া ভয়াবহ খরায় পতিত হয়। লোহা ও তামার খনি আবিষ্কৃত হলে দেশটির অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। ১৯৭৬ সালে স্পেনীয় সাহারার দক্ষিণ তৃতীয়াংশ স্পেন মোরিতানিয়াকে দিয়ে দেয়। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়া হয় মরক্কোকে। বিচ্ছিন্নতাবাদী একটি সংগঠন *পোলিসারিও ফ্রন্ট* পশ্চিম সাহারাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলে যুদ্ধের কারণে মোরিতানিয়ার অবস্থা নাজুক হয়ে যায়। ১৯৭৮ সালে সামরিক ক্যুতে রাষ্ট্রপতি দাদ্দাহ ক্ষমতাচ্যুত হন। তাকে অপসারণ করে সামরিক শাসক মুহাম্মদ উলদ লুলিও ক্ষমতায় আসেন। ১৯৭৯ সালের আগস্টে দেশটি পশ্চিম সাহারা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

মোরিতানিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতির প্রাবল্য লক্ষ্যণীয়। দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি বাচ্চাদেরকে আরবি, সরল পাটিগণিত,

ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা ও প্রথাগত অন্যান্য বিষয়ে শেখানো হতো। বাচ্চাদের আনুষ্ঠানিক পাঠের সূচনা ছিল সাত ও আট বছর বয়স থেকে। মেয়েদের দুই বছর মেয়াদি শিক্ষাকার্যক্রম ছিল মূলত পরিবারকেন্দ্রিক। ১৯৮০'র দশক পর্যন্ত মোরিতানিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে ছিল দ্বীনিয়্যাত, হিফজুল কুরআন ও অন্যান্য বুঁনিয়াদি বিষয়াশয়। উপনিবেশ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুল। পরবর্তীতে আগ্রাসীরা বিতাড়িত হলেও স্বাধীনতাত্তোর দেশে রয়ে যায় পশ্চিমা স্কুল ও শিক্ষা কারিকুলাম। এসময় ইসলামি শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে এবং পার্থিব উন্নতির লক্ষ্যে স্কুলের পাঠে ঝুঁকতে থাকে মানুষ। অপ্রতুল শিক্ষাসরঞ্জাম ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দীনহীন হয়ে পড়ে ইসলামি শিক্ষা।

আরব দুনিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত মোরিতানিয়ার ভাষা আরবি। এখানকার জীবনাচারের সঙ্গে আরব-ইসলামি ঐতিহ্য ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মানুষ কথা বলে আরবিতে, চলনে-বলনেও তারা পুরোদুস্তর আরব। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, আরব দুনিয়ার সঙ্গে এই মানুষগুলোর সখ্যতা সেভাবে গড়ে উঠেনি। এখানে ছোট ছোট বাচ্চারা বর্ণমালা শিখছে খোদাই করা কাঠের টুকরো দিয়ে। আরবের আমির-শাহজাদারা অঢেল অর্থ ব্যয় করার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের সম্পদ ব্যয় হচ্ছে ভোগব্যসনে। বিলিয়ন বিলিয়ন পেট্রো-ডলার পড়ে আছে পশ্চিমের ব্যাংক ও ফিন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলোতে। সৌদিপ্রিন্স ওয়ালিদ বিন তালালের কথাই ধরুন। এই যুবরাজ অঢেল বিত্তের অধিপতি। *ফোর্বস* ম্যাগাজিনের *মাল্টি বিলিওনিয়ার* তালিকার ওয়ালিদ সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন, পৃথিবীর সবচে উঁচু ভবন তৈরি করবেন তিনি। এক কিলোমিটার উঁচু এই ভবনের পাশে দুবাইয়ের ২৭১৭ ফুট উঁচু বুর্জ *আল-আরব* বামনে পরিণত হবে। ১৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের মালিক বাদশাহ আব্দুল্লাহর ভাগ্নে ওয়ালিদ *কিংডম হোল্ডিংসের* সত্ত্বাধিকারী। একই সঙ্গে রুপার্ট মারডকের নতুন কম্পানির শেয়ারহোল্ডারও তিনি। লোহিত সাগরের বন্দর শহর জেদ্দায় নতুন টাওয়ার নির্মাণের ঘোষণা দেওয়ার প্রাক্কালে যুবরাজ ওয়ালিদ বলেন, 'আমি খুবই আশাবাদী, আমরা সবসময় নতুন আবিষ্কারের ব্যাপারে আগ্রহী।'

একদিকে প্রিন্স আল-ওয়ালিদ ভবন নির্মাণ করে কিলোমিটার উপরে উঠে যাচ্ছেন, অথচ মোরিতানিয়ার গ্রাম্য শিশুরা অপ্রতুল শিক্ষাসরঞ্জাম ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বঞ্চিত হচ্ছে ঐতিহ্যগত ইসলামি শিক্ষা থেকে। পশ্চিমাধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাসহ আধুনিক শিক্ষাকে উন্নতির মাধ্যম হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। রবার্ট ফিস্কের ভাষায় বললে, 'আরব যুবরাজ, আমির, খলিফা ও প্রেসিডেন্টেরা হোটেল ও টাওয়ার নিয়ে হয়রান হয়ে আছেন। তোমারটার চেয়ে আমার পেইন্টিংটা বড়ো, আমার পেনসিলটা তোমারটার চেয়ে ধারালো, রঙপেনসিলটা তোমারটার চেয়ে চকচকে।' বিশ্ব এই শিশুতোষ খেলার দুঃখজনক চিত্র দেখতে থাকবে করুণ চোখে। কিন্তু প্রশ্ন করতে হয়, মোরিতানিয়ার গ্রাম্য শিশুদের কয়টি প্রকৃত রঙপেনসিল আছে?

হর্ন অব আফ্রিকার দুঃসময়

(প্রসঙ্গ : *সোমালিয়া ও আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ*)

...দলে দলে মানুষ প্রতিদিন এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে ঘুরে নিয়তির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করছে। কেনিয়ার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে এখন লাখো মানুষের ভীড়। একই অবস্থা ইথিওপিয়াতেও। গড়ে প্রতিদিন ১৭০০ সোমালি নাগরিক আশ্রয়ের আশায় জড়ো হচ্ছে এখানে।

ক্ষুধার্ত ও নিরন্ন নিরাশ্রয়ী মানুষের জন্য বিবৃতির ক'টি শব্দই কি যথেষ্ট? লাখ লাখ মানুষ বিপন্ন ও অসহায় অবস্থায় *হর্ন অব আফ্রিকা* খ্যাত সোমালিয়ায় জীবন-মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আল-জাজিরায় বৃদ্ধা সোমালি মায়ের যন্ত্রণাক্লিষ্ট অসহায় মুখ আমাদের মানবতাবোধকে আহত করে। যুদ্ধ-বিভীষিকা ও ক্ষুধা কাতরতা কুচকে যাওয়া চামড়ার অনেক গভীরে যেন তোলপাড় করছে। বৃটিশ ট্যাবলয়েড *টেলিগ্রাফে* উদ্ধৃত 'মাওয়ালিম' সত্তোরোর্ধ্ব বৃদ্ধা। নিঃশব্দ চোখে চেয়ে আছেন। আশা, এই দুর্দিনে কেউ না কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা এই বৃদ্ধা শেষবারের মতো একবার পেটপুরে খেতে পারবেন কি? উন্নত বিশ্বের দেশগুলো যেখানে বাজারমূল্য ঠিক রাখতে হাজার হাজার টন খাদ্য অ্যাটল্যান্টিকে বিসর্জন দিচ্ছে!

জাতিসংঘ সতর্ক করে দিয়েছে, ইথিওপিয়া, কেনিয়া ও সোমালিয়ায় যে দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, তা গত ষাট বছরেও দেখা যায়নি। এ অবস্থার পেছনে অনেকগুলো ফ্যাক্ট রয়েছে। বিশ্বে খাদ্যদ্রব্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে

যাওয়া, দীর্ঘকালীন খরা ও সোমালিয়ার অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ পরিস্থিতি নাজুক করে তুলেছে। এসব সংঘর্ষ লাখ লাখ মানুষকে পরিণত করেছে উদ্বাস্তুতে। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে পূর্বআফ্রিকায় বৃষ্টিপাত কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ। ফলে খরা পরিস্থিতি প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। খরা সমগ্র পূর্বআফ্রিকার জনজীবনকে লন্ডভন্ড করে দেয়। সাধারণভাবে এ অঞ্চলের মানুষ, ফল-ফসল ও পশুপাখি বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল। খরাকালীন জলাশয়গুলো পানির একমাত্র আধার। কিন্তু বৃষ্টি না হওয়ায় জলাধারগুলোও এখন পানিশূন্য। জাতিসংঘের পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য সহায়তার প্রয়োজনীয়তার কথা। আনুমানিক ১১ মিলিয়ন (১ কোটি ১০ লাখ) মানুষ 'খারাপ মানবিক বিপর্যয়ে' পর্যুদস্ত। পুরো হর্ন অব আফ্রিকায় ছড়িয়েছে খরার প্রকোপ, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যুদ্ধবাজ গোত্রপতিদের হানাহানি। আছে প্রতিবেশী কেনিয় ও ইথিওপিয় খৃস্টান মিলিশিয়া বাহিনী, মেরিন স্নাইপার ও ড্রোন বিভীষিকা।

শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে সংঘাত ছড়িয়ে দেওয়া সাম্রাজ্যবাদের পুরনো বাতিক। পনেরটি বছর যেসব যুদ্ধবাজ গৃহযুদ্ধ চালিয়ে ১০ লাখ লোককে হত্যার মধ্য দিয়ে সোমালিয়াকে বিশ্বের সবচে বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল, ইসলামপন্থীরা তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। যে দেশটি শাসন করা অসম্ভব মনে হচ্ছিল, ছয়মাসে সে অসম্ভব কাজটিকে তারা সম্ভব করে আনে। কোনো ধরনের নির্যাতন, পাশবিক শাস্তি না দিয়ে, ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে তা তারা অর্জন করে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা, সেখানে ইসলামপন্থীদের সরিয়ে তাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে, যে সরকার তৈরি হয়েছে মুজাহিদীনের বিজয়েরও অনেক আগে। এ সরকারে আছে পরাজিত সেসব যুদ্ধবাজ, সোমালিয়দের বেঁচে থাকবার পথে যারা প্রধান অন্তরায়। দীর্ঘ দুর্ভোগের শিকার সোমালিয়দের শান্তির জন্য ইসলামপন্থীরা নেতৃত্ব নিতে পারে। কিন্তু গোল বাঁধে যখন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে বড়ো ধরনের ঝুঁকি নেয় এবং কেউ অবাক হবে না, যদি শিগগিরই দেশটির যুদ্ধবাজেরা আগ্রাসী হয়ে উঠে কিংবা ইসলামপন্থীরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। ইথিওপিয়ার অগ্রহণযোগ্য সরকারের সোমালিয়ায় সামরিক আগ্রাসনকে

ওয়াশিংটন এজন্য সমর্থন করেছে, তারা সেখানকার ইসলামপন্থীদের 'নতুন তালেবান' বিবেচনা করে। তাদের বিরুদ্ধে আল-কায়েদাদের 'আশ্রয় দানের' অভিযোগ আনা হয়েছে।



এসব ছবির ক্যাপশন হয় না। ছবি : গ্রীন টাইম ডটকো

সোমালিয়ার 'আল-শাবাব' যোদ্ধারা আল-কায়েদার ঘনিষ্ঠ। ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠা ও পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে জিহাদের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে তাঁরা। প্রায় দুই দশকে দেশের একটি বড়ো অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমে সক্ষম হয় আল-শাবাব। সোমালিয়ার পুতুল সরকার ও আফ্রিকান ইউনিয়ন বাহিনী তাঁদেরকে পরাস্ত করতে সমর্থ নয়। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত *আল-শাবাবের* আক্ষরিক তরজমা- 'তারুণ্য'। প্রথমদিকে সোমালিয়ায় মোতায়েন ইথিওপিয় সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও ধীরে ধীরে এই লড়াই সোমালিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর যোদ্ধারা ইসলামের মৌলিক ভাবধারা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেন। 'গ্লোবাল জিহাদের' চিন্তকদের নেতৃত্বে সোমালিয়ার বড়ো একটি অংশে শরিয়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করার পর পরই ক্রুসেডার সন্ত্রাসীরা দিন-রাত ড্রোন আক্রমণের মাধ্যমে স্থানীয় নাগরিকদের জীবনকে বিভীষিকাময় করে তোলে।

কেনিয়ার চরম দুর্দশাগ্রস্ত তিনটি ক্যাম্পের অন্যতম 'দাদাব'। ক্ষুধার্ত ও হাড়কঙ্কাল মুমূর্ষ মানুষেরা এই ক্যাম্পে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। গৃহযুদ্ধ, জাতিগত সহিংসতা ও খরার পীড়ন মানুষের বেঁচে থাকবার প্রতি যেন প্রকৃতির নির্মম শাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এসব জনপদ দীর্ঘ পীড়নের শেষসীমায় উপনীত। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি সংস্থার (*WFP*) মতে, বিগত ষাট বছরের মধ্যে এটি সবচে ভয়াবহ খরা। এর ভৌগলিক বিস্তৃতি ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, জিবুতি ও কেনিয়া পর্যন্ত। সুদান ও ইরিত্রিয়াও এই বিপর্যয় কেন্দ্র থেকে দূরে নয়। *ডব্লিউএফপি* বলছে, দুর্দশাগ্রস্ত এসব মানুষের জন্য ৫০০ মিলিয়ন ডলার জরুরি অর্থ সহায়তা প্রয়োজন। যদিও এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৬০ শতাংশের বেশি নয়। প্রয়োজন জরুরিভিত্তিতে খাদ্য সংস্থান ও নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, ইথিওপিয়ায় ৫ মিলিয়ন মানুষ কলেরার ঝুঁকিতে আছে। আক্রান্ত বহু মানুষ ইতোমধ্যে মারা গেছে। অনেকের অবস্থা সংকটাপন্ন। কলেরা ও এর উপজাত অন্যান্য উপসর্গ যেমন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মরছে মানুষ। মৃতের পরিসংখ্যানে প্রতিদিনই যোগ হচ্ছে নতুন নতুন নাম। *ডব্লিউএইচও* মুখপাত্র *তারিক* জানাচ্ছেন, ইথিওপিয়ার ৮.৮ মিলিয়ন মানুষ মহামারি সংক্রমণের মুখে। সংবাদ সংস্থাকে তিনি বলেন, 'সোমালিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের পরিস্থিতিও কমবেশি একই। বিশেষ করে উদ্বাস্তু শিবিরগুলো এধরনের সংক্রমণে বেশি আক্রান্ত এবং এসব নিয়ন্ত্রণ দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে।' বাস্তুত্যাগী এসব মানুষের জন্য নেই নিরাপদ আশ্রয় শিবির। দলে দলে মানুষ প্রতিদিন এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে ঘুরে নিয়তির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করছে। কেনিয়ার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে এখন লাখো মানুষের ভীড়। একই অবস্থা ইথিওপিয়াতেও। গড়ে প্রতিদিন ১৭০০ সোমালি নাগরিক আশ্রয়ের আশায় জড়ো হচ্ছে এখানে। কিন্তু ইথিওপিয়ার প্রায় ৮৫ মিলিয়ন (৮ কোটি ৫০ লাখ) মানুষের অবস্থা যেখানে শোচনীয়, সেখানে এসব নয়া আগন্তুকের নিরন্ন মৃত্যু ছাড়া আর কি আশা করা যায়? *বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার* তথ্য মতে, ইথিওপিয়ার ৪.৫ মিলিয়ন মানুষের জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো (*ডব্লিউএফপি*, *ডব্লিউএইচও* এবং *ইউনিসেফ*) আগে থেকে এধরনের ক্রাইসিস নিয়ে সতর্কতা জানিয়ে আসছিল। কিন্তু বিশ্বের প্রধান প্রধান প্রচারমাধ্যমে এ সংবাদ এতোদিন গুরুত্ব পায়নি। যেটুকু প্রচারিত হয়েছে, তা নিয়েও কারো মাথা ব্যথা ছিল না। সম্পদশালী দেশগুলো সহায়তার হাত বাড়াতে গড়িমসি করেছে। বৃটিশ পত্রিকা টেলিগ্রাফ এক রিপোর্টে জানিয়েছে, 'এপর্যন্ত আফ্রিকার কোনো দেশ 'হর্ন অব আফ্রিকা'র এই বিপর্যয়ে অর্থ সহায়তার ঘোষণা দেয়নি।'

'অক্সফাম রিজিওনাল ক্যাম্পেইনসে'র ইস্ট এন্ড সেন্ট্রাল আফ্রিকার পলিসি ম্যানেজার *মাইকেল ও'ব্রেইন* ১৫ জুলাই প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, 'আফ্রিকার সমস্যায় আফ্রিকার সমাধান'-এর ক্ষেত্রে লিবিয়া ও হর্ন অব আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ নিয়ে আফ্রিকান ইউনিয়ন ব্যর্থ।'

টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, বৃটিশ সরকার ইথিওপিয়ার খৃস্টানদের জন্য ৩৮ মিলিয়ন পাউন্ড খাদ্য সহায়তা দেবে। এর একদিন পর বৃটিশ পত্রিকা *ডেইলি মিরর* লিবিয়া আক্রমণ নিয়ে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা প্রকাশ করে। প্রকাশিত রিপোর্টে *জেমস লিয়ন* লিখেছেন, লিবিয়া আক্রমণে বৃটিশ সরকার যুদ্ধ বিমানগুলো পরিচালনা করতে এপর্যন্ত ২৬০ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ ব্যয় করেছে। *ডব্লিউএফপি* বলছে, ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ সহায়তা পেলে এখানকার ১১ মিলিয়ন অনাহারী মানুষের খাদ্যের সংস্থান সম্ভব! *ডেইলি মিরর* জানাচ্ছে, লিবিয়ায় পশ্চিমাজোট পরিচালিত যুদ্ধে ইতালির এয়ারবেস থেকে লিবিয়ার ওয়ারজোনে উড়ে যেতে একেকটি বৃটিশ টর্নেডো বিমানের ঘণ্টা প্রতি খরচ ৩৫ হাজার পাউন্ড।...

পশ্চিমারা বিশ্ব নিয়ে একধরনের কানামাছি খেলায় মেতেছে। কুড়িটি বছর গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত সোমালিয়ায় খাদ্য, ঔষধ ও অন্যান্য আশ্রয় সরঞ্জামের পরিবর্তে মার্কিন ড্রোন থেকে যখন হাজার পাউন্ড ওজনের *হেল ফায়ার* ছুড়ে মারা হয়, তখন আমরা এসব দেশের অনাহারী মানুষের বাস্তুচ্যুতি অথবা নিরন্ন মৃত্যু ছাড়া কি-ইবা আশা করতে পারি? সোমালিয়ায় বিশ বছরে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার

গড়ে উঠেনি। ইসলামপন্থী 'আল-শাবাব' দেশটির অধিকাংশ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সরকার গঠন করলে মার্কিনিরা তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যায়িত করে গৃহযুদ্ধ উস্কে দেয়। ফলাফল, লাখো মানুষের বাস্তুত্যাগ। এখন, 'বাতুলা মাওয়ালিম'দের জন্য প্রয়োজন প্লাস্টিকের আচ্ছাদন, খাদ্য ও ঔষধসামগ্রী। যদিও এর সামান্যটুকু কেবল পৌঁছানো গেছে। (২০১১ সালে প্রকাশিত)

আবাবিলের নিশানা!

(প্রসঙ্গ : ওয়েস্টগেট শপিংমল হামলা)

...আড়াই দশক ধরে অচল সোমালিয়া। বিশ বছরে অন্তত ১৪বার দেশটির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রতিবারই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত সোমালিয়ার নিয়ন্ত্রণ *আল-শাবাবের* হাতে আসার পরই মোগাদিসুর জনপদ মার্কিন হেলফায়ারে বিধ্বস্ত হতে শুরু করে।

জলাতঙ্কে ভুগছে এসময়ের বৃটিশেরা। 'হাইড্রোফোবিয়া' (জলাতঙ্ক) আক্রান্ত রোগী পানি দেখলে আতঙ্কিত হয়। বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের বোধহয় এমন জলাতঙ্ক এখন। ওসামা বিন লাদেন, আনওয়ার আল-আওলাকি, আবু মাসয়াব আল-জারকাবি -এসব নামের পর এবার এক মাসতুরাত (নারী) 'জঙ্গি'র ভয়ে কাঁপছে পাশ্চাত্যজগত। 'ইসলামি সন্ত্রাসের' নতুন বয়ান ধর্মান্তরিত জনৈক নারী *সামান্থা লেইথওয়েট*। 'শ্বেতাঙ্গ বিধবা' বলে পশ্চিমারা তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। শব্দবন্ধটি একধরনের বর্ণবিদ্বেষ ধারণ করে। ওই নারীর স্বামী লন্ডনের টিউব রেলের সিরিয়াল বিস্ফোরণের নায়কদের একজন। হামলায় নিজেও তিনি নিহত হন।

সামান্থার জন্ম আয়ারল্যান্ডে। বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীতে। দুই কন্যার জননী সামান্থা গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, আল-কায়েদার সঙ্গে জড়িত। আফ্রিকার একটি মহিলা সশস্ত্র সংগঠনকে বিভিন্ন সময় সহযোগিতার অভিযোগও আছে তাঁর বিরুদ্ধে। ইউরো ২০১২ চলাকালীন কয়েকটি বিস্ফোরণেও নাকি তাঁর 'হাত' ছিল। তাঁকে নিয়ে হরেক রকমের আন্দাজ-অনুমান বৃটেনজুড়ে। হিজাবে আবৃতা এই নারী বৃটিশের সুখনিদ্রায় খানিকটা দুঃস্বপ্ন তৈরি করেছেন বৈকি!

ঘটনা সাম্প্রতিক কালের। কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে ইসরঈল নির্মিত শপিংসেন্টার 'ওয়েস্টগেট শপিংমলে' হানা দিয়েছে সোমালি সশস্ত্র সংগঠন *আল-শাবাব*। দুই বছর ধরে রয়ে-সয়ে অবশেষে পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছে তারা। বৃটিশ এমআই-৫ এর দাবি, হামলা পরিকল্পনায় সামান্থা যুক্ত ছিলেন।

আড়াই দশক ধরে অচল সোমালিয়া। বিশ বছরে অন্তত ১৪বার দেশটির ব্যাপারে 'আন্তর্জাতিক উদ্যোগ' নেওয়া হলেও প্রতিবারই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত সোমালিয়ার নিয়ন্ত্রণ *আল-শাবাবের* হাতে আসার পরই মোগাদিসুর জনপদ মার্কিন হেলফায়ারে বিধ্বস্ত হতে শুরু করে। দীর্ঘ দুই দশক পার্শ্ববর্তী খৃস্টান ইথিওপিয় ও যুদ্ধবাজ গোত্রপতিদের হানাহানিতে বিধ্বস্ত দেশটিতে মুক্তির বারতা নিয়ে আসে আল-*শাবাব*। 'এই দেশ শাসন করা অসম্ভব' এটি মিথ্যা প্রমাণ করে তারা কার্যকর সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলে। কিন্তু সেখানে ইসলামপন্থীদের সরিয়ে পশ্চিমাদের মনোঃপুত কিছু পুতুলকে ক্ষমতায় বসানো হয়। উস্কে দেওয়া হয় গৃহযুদ্ধ।

'হরকত আল-শাবাব আল-মুজাহিদিনে'র যোদ্ধা প্রায় ৯ হাজার। দলটি শরিয়া প্রতিষ্ঠা ও পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে জিহাদ-প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। দুই দশকে তারা দেশের একটি বড়ো অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছে। সোমালিয় পুতুল সরকার ও আফ্রিকান ইউনিয়ন বাহিনী তাদের সঙ্গে বেশ কিছু যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে।

আল-শাবাবের শক্তিকেন্দ্র সোমালিয়ার অবস্থা ২০১০ সাল থেকে শোচনীয়। বৃষ্টিপাত নেই। দেশটির জলাধারগুলো পানিশূন্য। খরা ও দুর্ভিক্ষ জনজীবন লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। জাতিসংঘের ভাষ্যে, ১১ মিলিয়ন মানুষ 'মানবিক বিপর্যয়ে' পর্যুদস্ত। খরা ছড়িয়ে পড়েছে হর্ন অব আফ্রিকা জুড়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহিরাগত দখলদারের বিরামহীন আগ্রাসন। থেমে নেই পশ্চিমা ক্রুসেডারদের যুদ্ধ-হত্যা তৃষ্ণা। সোমালিয়া জুড়ে নির্বিচার ড্রোন হামলার খবরাখবর আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় অহরহ পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই এতোসব

অবিচার ও মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রতিক্রিয়া কিছু '*শাবাব*'কে (তরুণ) টেনে নিয়ে গেছে নাইরোবির ওয়েস্টগেটে।

নাইরোবি অ্যাটাকের পর সোমালি যোদ্ধাদের নিয়ে আরেকবার নড়েচড়ে বসেছে পশ্চিমাবিশ্ব। এর পয়লা পদক্ষেপে ওয়েস্টগেটে ইসরঈলি কমান্ডো পাঠিয়েছে যৌথ-কমান্ড। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। হামলায় নিহতের সংখ্যা ৬৭, আহত ১৫০-এর অধিক। নিহতদের বেশিরভাগ নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্য। ওয়েস্টগেট শপিংমলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটক ও কূটনৈতিকেরা শপিং করতে আসেন। এখানে কেনিয় সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তারা আসেন আনন্দ-বিনোদনের জন্য। শপিংমলটিতে ইহূদি ও মার্কিনিদের মালিকানাধীন বহু শপ রয়েছে। এসব কারণেই আল-শাবাব হামলার জন্য একে বেছে নেয়।

সোমালিয়া থেকে কেনিয় সৈন্য প্রত্যাহার না করার কারণ হিসেবে হামলা চালানোর কথা বলা হয় *আল-শাবাবের* পক্ষে। ২০১১ সালে কেনিয় সরকার সোমালিয়ায় চার হাজার সৈন্য মোতায়েন করে। উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেওয়া সোমালি বেসামরিক নাগরিকদের উপর বোমাবর্ষণ এবং 'গেডো' ও 'জুবা' অঞ্চলে নিরপরাধ জনগণের উপর গণহত্যার কৃতিত্ব আছে আগ্রাসী এই সেনাদের। এতোসব অপরাধের পর পাল্টা জবাব তো তাদের ভাগ্যলিপিই বলা যায়। *আল-শাবাব* মুখপাত্র আব্দুল আজিজ মুসকাব সোমালিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা না হলে এধরনের হামলা অব্যাহত থাকবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন। 'এমনও হতে পারে প্রতিদিনই কেনিয়ার কোনো না কোনো শহর জ্বলে উঠবে।' তিনি মনে করেন, আরো ওয়েস্টগেট আবাবিলের নিশানা হয়েই থাকবে!

'কেনিয় সৈন্যরা সোমালিয়ায় কী করছে?' সোশ্যাল নেটওয়ার্কে জনৈক ব্যবহারকারী কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উহুরু কেনিয়াত্তার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়েছেন। ইসরঈলের অভয়ারণ্য কেনিয়ার মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। সোমালিয়ায় সৈন্য মোতায়েন ও গণহত্যার মতো কাজের পুরস্কার স্বরূপ পশ্চিমারা তার ক্ষমতার বৈধতা দিয়েছে। উহুরুর মতো দুর্বৃত্তপনার রেকর্ড এ অঞ্চলের আর

কারো ঝুঁলিতে নেই। ওয়েস্টগেটে কয়েকটি লোকের মৃত্যু নিয়ে তিনি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছেন। অথচ নিজের দেশে কসাইখ্যাত এই লোক নির্বাচিত হওয়ার প্রাক্কালে কয়েক হাজার মানুষকে বলি দিয়েছেন।

ওয়েস্টগেট নিয়ে যারা মানবতার দোহাই গাইছেন, ইথিওপিয়া, উগান্ডা ও কেনিয় সৈন্যদের চালানো বর্বরতায় সাড়ে বারো লাখ সোমালির মৃত্যু নিয়ে বিবৃতির একটি লাইনও খরচ করেননি তারা। দার্শনিক ফ্রয়েড মনে করেন, মানুষের আগ্রাসী মনোভাবের উৎস তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা পশুত্ব। সভ্যতা ও পশুত্বের মাঝে পাতলা একটি আস্তরণ রয়েছে। সংঘাত কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোড়ন উঠলে ওই সূক্ষ্ম পর্দা ছিঁড়ে যায়। বেরিয়ে আসে মানুষের পশুসত্ত্বা। সভ্যতার কারণে মানুষ অহিংস হয়ে যায়নি, সহিংসতা শুধু পদ্ধতি বদল করেছে। আজকের পৃথিবীতে কেউ লাখ লাখ আফগানের মৃত্যুকে বিশ্বের অবিচার বলে আখ্যায়িত করে না। সাঁইত্রিশ বছরে ৫০ লাখ আফগানের হত্যাকে কেউ আগ্রাসন বলছেন না। পুরো রাষ্ট্রের এক দশমাংশ মানুষের মৃত্যুকেও কেউ বর্বরতা বলে আখ্যায়িত করছে না। দশকব্যাপী অবরোধে ইরাকে সাড়ে চার লাখ শিশুসহ যুদ্ধ ও গণহত্যায় আরো ১২ লাখ মানুষের মৃত্যুকে কেউ নিপীড়ন বলছে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ৬৬ বছর ঘরহারা ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের মানবেতর জীবন নিয়েও কারো মনোবেদনা জাগে না। আমরা দেখেছি, বামিয়ানে যখন বুদ্ধমূর্তি ভেঙে ফেলা হলো, তা নিয়ে মূর্তি-সংস্কৃতিপ্রেমীরা কীভাবে আর্তনাদ করেছে? আমরা আরো দেখেছি, বিশ্বসংস্থা ও পশ্চিমাদের মায়াকান্না। একটি পাথুরে মূর্তির জন্য বিশ্ব শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়, কিন্তু লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তারা আশ্রয় নেয় পরিসংখ্যানের! মূর্তির জন্য কাঁদতে পারলে, মানুষের জন্য কেন তারা কাঁদে না? তবে কী আজকের পৃথিবীতে পাথুরে মূর্তির চেয়েও ওই মানুষগুলো মূল্যহীন? সোমলিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান কিংবা ইয়েমেনে নির্বিচার ড্রোন-মিসাইলে যাদের শেষ করে দেওয়া হচ্ছে, তাদের জীবন কি এতোই তুচ্ছ? (২০১৩ সালে একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত)

আয়লান কুর্দি ও
বাকসোবন্দী মানবতার গল্প
(প্রসঙ্গ : *বাস্তুসংকট ও পশ্চিমা দ্বিচারিতা*)

বলকান রুট ধরে পিপড়ের মতো উদ্বাস্তু ও অভিবাসী ধেয়ে চলেছে জার্মানির দিকে। লক্ষ্য মাথাগোঁজার একটু ঠাঁই, আশ্রয়। যুদ্ধ, অমানবিকতা-বিভীষিকা থেকে প্রাণে বাঁচতে উত্তাল সাগরের ঢেউ পেছনে ফেলে শরণার্থীর সারি কড়া নাড়ছে ইউরোপের দ্বারে-দুয়ারে! যেন 'উদ্বাস্তু-বন্যা' দেখা দিয়েছে। ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে জাহাজ, ট্রলার, ফিশিংবোট, স্পিডবোট ধরে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ফিরছে ছিন্নমূল বাস্তুহারার দল। কারো ভাগ্যে নিরাপদ অবতরণ জুটছে, কারো সলিল সমাধি ঘটছে- অনন্ত নীলের বুকে। এই গল্প সিরিয় বাস্তুহারাদের। সাগরের তীব্র সুনীল জলরাশির তোড়ে ভেসে আসা মানবশিশুর নিথর দেহ ব্যঙ্গ করছে মানবতার কাগুজে বাণীকে। শুধু সিরিয়া নয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রতিটি জনপদ থেকে, গৃহহারা-সহায়হীন মানুষ দিকবিদিক ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। 'মুসলিম' হওয়া, পৃথিবীতে কে দেবে তাঁদের ঠাঁই?

উদ্বাস্তু ও অভিবাসীর মৌলিক পার্থক্য- সব উদ্বাস্তু অভিবাসী হলেও সব অভিবাসী উদ্বাস্তু নয়। আর্থিক ও অন্য অনেক কারণে অনেকে স্বেচ্ছায় অভিবাসনে যায়। কিন্তু উদ্বাস্তু মাত্রই স্বদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। তাই যুদ্ধই উদ্বাস্তু (এবং অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির) মূল কারণ। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে জাতিসংঘের 'মানবাধিকার' কমিশন প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, সিরিয় উদ্বাস্তুর সংখ্যা কম করে হলেও চল্লিশ লাখ। এর মাঝে অর্ধেকের আশ্রয় জুটে

তুরস্কে। পনেরো লাখের অবস্থান লেবাননে। কিছু শরণার্থী আছে জর্দানসহ প্রতিবেশী দেশগুলোতে। ৭৫% সিরিয় নিজ ভূমিতে বাস্তুচ্যুত। নেই আবাসন, কর্মসংস্থান। খাদ্য-বস্ত্র, ভিটে-মাটিহীন মানুষের বেঁচে থাকাটাই যেন বিরাট দায়। স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে ব্যারেল বোমার ভয়ে। সিরিয়াসহ দূরপ্রাচ্যের সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে এক কোটি ৪০ লাখ শিশু বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না। শতকরা হিসেবে চল্লিশ শতাংশ। এভাবে একটি সম্পূর্ণ প্রজন্ম শিক্ষা অর্জন থেকে বঞ্চিত রয়ে যাচ্ছে।

১৯৫১ সালে উদ্বাস্তু কনভেনশনে *ইন্টারন্যাশনাল রিফুজি অ্যাক্ট* পাস হয়। এই আইন বলে- *'উদ্বাস্তুদের রক্ষা, তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো ও আশ্রয় দানে বাধ্য থাকবে অন্য দেশ। ততোক্ষণ তাদেরকে নিজ দেশে ফেরৎ পাঠানো যাবে না, যতোক্ষণ না তাদের দেশ তাদের জীবনের জন্য নিরাপদ হয়।'*

সিরিয়ার প্রতিবেশী আরব দেশগুলো শরণার্থীদের জন্য দুয়ার খোলা রাখলেও ইউরোপিয়রা তাদেরকে হুমকিই মনে করে। সৌদি আরব পঁচিশ লাখ সিরিয়র আশ্রয় ও পাঁচ লাখের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। উদ্বাস্তু পরিবার প্রতি বার্ষিক ৫০ হাজার ডলার অনুদান ঘোষণা দিয়েছে কাতার। গালফভুক্ত দেশগুলো উদ্বাস্তুদের জন্য ৯০০ মিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তা দিয়েছে। আরবরা শরণার্থীদেরকে তাঁবুতে না রেখে নিজেদের মধ্যে আপন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এসব দেশে শরণার্থীদের আগমন নিয়ে হৈ-চৈও হয়নি। বরং হল্লা দেখা দিয়েছে এই কাফেলা ইউরোপমুখী হওয়ার পর। আগ্রাসী ও যুদ্ধবাজ ইউরোপিয় দেশগুলো উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে নারাজ। বাস্তুচুত্য, নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে তাদের অমানবিক আচরণ খোদ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, সভ্য পৃথিবীর জন্য যা নিদারুণ লজ্জার। ঠাঁইনাড়া মানুষের সঙ্গে 'সভ্য' ইউরোপের এই রূঢ়তা তাদের জংলিপনা ও কথিত মানবাধিকারের স্বরূপকে প্রকাশ করে।

ভিত্ত-ভিটা ফেলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে মধ্য ইউরোপ, বিশেষ করে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় প্রবেশের চেষ্টায় আছে শরণার্থীরা। নৌকায়, ট্রেনে ও ট্রাকে চেপে যুক্তরাজ্যে ঢোকার চেষ্টাও করছে অনেকে।

বিভীষিকাময় এই যাত্রাপথে জীবন হারাচ্ছে হাজারো নিরাশ্রয়ী মানুষ। ঢেউয়ের তোড়ে সাগর তীরে ভেসে আসা *আয়লান কুর্দির* মৃতদেহ মানুষের বিবেকের দুয়ারে খানিকটা নাড়া দিয়েছিল। শুধু এক আয়লান নয় সিরিয়ার ঘরে-বাইরে শতো আয়লানের সঙ্গে নিত্য ঘটছে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনার। আয়লানের মতো হাজারো শিশু মা-বাবার হাত ধরে রোজই বেরুচ্ছে অজানার পথে। অনিশ্চিত এই যাত্রায় ভাগ্য ভালো হলে হয়তো আশ্রয় মিলবে কোনো শরণার্থী শিবিরে, অথবা মুখ গুজে পড়ে থাকবে অজানা কোনো সাগর-সৈকতে! বালিতে জবুথবু ছোট্ট শিশুটি জীবন দিয়ে বিশ্বের 'বিবেকবান' মানুষকে জানাতে চেয়েছে নিপীড়িত মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা। এই একটি নির্বাক ছবিই যেন নিপীড়িত হাজারো হৃদয়ের আহাজারি হয়ে উঠেছে। নিজের তিন বছরের জীবনের মূল্যে আজ পৃথিবীর চর্চার কেন্দ্রে সিরিয় উদ্বাস্তু সমস্যা। এই বিশাল পৃথিবীতে একটুখানি আশ্রয়ের সন্ধান দিতে না পারলেও কবরের ব্যবস্থা তো ঠিকই করতে পেরেছে মানুষ। আবদুল্লাহ কুর্দি তিন বছরের সন্তানকে মাটিচাপা দিয়ে আবেদন করলেন, এবার অন্তত থামুক মৃত্যুমিছিল। পরিসংখ্যানমতে, সমুদ্রপথে ইউরোপে পৌঁছানোর চেষ্টাকালে শুধু ২০১৫ সালেই তিন হাজার শরণার্থী জীবন দিয়েছে।

উদ্বাস্তু সংকট নিয়ে বৈশ্বিক আলোড়নের মুখে ২০০ সিরিয়কে 'আশ্রয়' দিয়ে নিজের 'ঔদার্য' প্রকাশ করেছে বৃটিশ। অন্যদিকে সেপ্টেম্বরে (২০১৫) কোনো (মুসলিম) শরণার্থী গ্রহণ করবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে জাপান! জাতিসংঘের তরফে বলা হচ্ছে, 'ইউরোপিয় ইউনিয়নের উচিত অন্তত ২ লাখ গৃহহীন সিরিয়র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।' এ নিয়ে ইইউভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে চলছে বাদানুবাদ। জার্মানি সাহায্যের সামান্য হাত বাড়ালেও হাঙ্গেরি বন্ধ করে দিয়েছে সীমান্ত। উদ্বাস্তু সংকটকে কেউ কেউ নিজেদের ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার হাতিয়ারও করছে। ইউরোপ খোলাখুলি বলছে, '*খৃস্টান হও, আশ্রয় নাও!*'

২০১১ সাল থেকে এ-পর্যন্ত পনেরোশ' শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে 'মানবতার মহান ত্রাতা' আমেরিকা। তাদের শঙ্কা, বেশি পরিমাণে শরণার্থী নিলে এরা 'জঙ্গিতে' পরিণত হয়ে দেশটির নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে! এই

কথিত 'নিরাপত্তা' ভাবনা কি আসলেই যৌক্তিক? শরণার্থীদের নগণ্য উপস্থিতি নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি তৈরি হওয়ার কতটুকু সম্ভাবনা তৈরি করে? যাদের বেঁচে থাকাটাই দায় হয়ে উঠেছে, সহিংস হয়ে উঠবার তাদের সুযোগই-বা কোথায়?



উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল দাঙ্গাবাজ মানুষরূপী ইউরোপ। ছবি : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ডাটাবেজ

শরণার্থী শিবিরগুলোতে *সেভ দ্য চিলড্রেনের* পক্ষ থেকে পরিচালিত পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, শরণার্থীদের অধিকাংশই শিশু-কিশোর। সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিন লাখ শরণার্থী শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। উন্নত সুযোগ-সুবিধার জন্য তারা যে দেশগুলোকে বেছে নিচ্ছে সেখানে তারা আদৌ কোনো সুবিধা পাবে কিনা তাও নিশ্চিত নয়। ঠিক কী পরিমাণ শিশু এখন পর্যন্ত সীমান্তের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আছে তারও নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই। এসব শিশুর ভবিষ্যৎ কী? কোথায় গেলে নিশ্চিত হবে তাদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ? ফ্রান্সে হিংসার আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু শরণার্থী শিবির। ধোঁয়ায়, জিঘাংসার অনলে দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন অসংখ্য শরণার্থী, মানুষ! *সেভ দ্য চিলড্রেন* হয়তো কিছু অনাথ শিশুকে পুনর্বাসিত করবে। কিন্তু অন্ধকারেই

থেকে যাবে লাখ লাখ মুসলিম শিশুর জীবন। দেশটির চলমান অস্থিরতা নিরসন না হলে ঝরে পড়বে সিরিয়ার গোটা ভবিষ্যৎ।

উদ্বাস্তুরা স্বপ্ন দেখে না

অস্থায়ী আশ্রমগুলোতে কেমন আছেন শরণার্থী 'মানুষ'? একদিন যাদের সমৃদ্ধ জীবন ছিল, দু'চোখ ভরে স্বপ্ন ছিল, গর্ব করবার মতো অতীত ছিল, আজ তাঁদের একটিই পরিচয়- উদ্বাস্তু! এখানে নেই শিক্ষিত-সজ্জন। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বা প্রাজ্ঞ রাজনীতিক। ধর্মীয় জ্ঞানে পুষ্ট আলেম বা সফল ব্যবসায়ী, খেটে খাওয়া মজদুর। এখানে সব পরিচয় 'উদ্বাস্তুতে' লীন হয়েছে। তাঁরা আজ অন্যদেশে আশ্রয়প্রার্থী! পরগাছা তুল্য! খাঁচাসদৃশ খুপরি তাঁদের বসতি। মাথাগোঁজার মতো একটু ঠাঁই তাঁদের পরমপ্রাপ্তি। এককালের সমৃদ্ধ সিরিয়ার মানুষ আজ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে 'শরণার্থী' পরিচয়ে। কারো কারো 'মহানুভবতায়' তাঁদের আশ্রয় জুটেছে 'অস্থায়ী আশ্রমে'। অস্থায়ী এই আশ্রয়গুলো কতদিন তাঁদের আগলে রাখবে!

যুদ্ধ-বিভীষিকা পেছনে ফেলে আসা মানুষেরা আজ স্বপ্ন দেখে না। তাঁদের ধুসর পৃথিবীতে হরদম যুদ্ধ, আগুন, বারুদের ঘ্রাণ! আজকের পৃথিবীতে তাঁদের জীবনগুলোই শুধু মানবিক। দুরন্ত কৈশরের ছুটে চলা ডানপিটে আজ উদ্বাস্তু শিবিরের হিস্ট্রিয়াগ্রস্ত বালক! এখানে জীবনের হল্লা নেই। এখানে আকাঙ্ক্ষার ব্যাপ্তি নেই। এখানে মানুষ শরণার্থী!

পৃথিবীর শান্তিকামী ও বিবেকবান মানুষেরা চায় বাশারের বর্বর শাসনের অবসান। নিরীহ মানুষের সহায়তায় পশ্চিমের দ্বিধাগ্রস্ততা ও পরাশক্তিগুলোর বিরোধিতা পরিস্থিতির অবনতি ছাড়া ভালো কিছু করতে পারেনি। আজকের পৃথিবীতে মুসলিম হওয়াই হয়তো এই শরণার্থীদের গুরুতর অপরাধ!

গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের কৌতুক!

(প্রসঙ্গ : *সাম্রাজ্যবাদের নোংরা খেলা*)

...আপনি যদি বন্দর চালাতে চান কিংবা আত্মরক্ষার জন্য পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হতে চান, তবে আপনার উচিত নিজের নাম পাল্টে ও'রেলি, শোয়ার্জ বা প্যাটেল রাখা এবং প্রার্থনার জন্য আপনার মুখ মক্কার দিকে ফেরানো বন্ধ করা!

আজকের পশ্চিমাবিশ্বে খোলাখুলি ইসলাম ও আরবদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অপমান প্রকাশ সমাজের একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। *দুবাই বন্দর চুক্তির* মুখ থুবড়ে পড়া এর সর্বশেষ উদাহরণ। আমেরিকায় ব্যাপক রাজনৈতিক ডামাডোলের কারণে দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় বন্দরগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য সবচে পেশাদার বন্দর পরিচালনাকারী *ডিপি ওয়ার্ল্ড*কে চুক্তি থেকে জোরপূর্বক বিরত করা হয়। এ রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা মূল বিষয় ছিল, *ডিপি ওয়ার্ল্ড* আরবদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ও গণমাধ্যমের জোর প্রচারণা ছিল, 'আমাদের বন্দর থেকে আরবদের দূরে রাখো।' কারো একথা স্মরণ করার গরজই পড়েনি, সৌদিসহ উপসাগরীয় দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কম্পানিগুলোতে ১২ হাজার ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে!

ইসলাম বিদ্বেষী দুই দলীয় একটি জোট, রক্ষণশীল ইভাঞ্জেলিক খৃস্টান, প্রচারসর্বস্ব ডেমোক্র্যাট ও শক্তিশালী ইসরঈলি লবি তাদের প্রেসিডেন্টকে বন্দর সংক্রান্ত এ পরিকল্পনা প্রত্যাহারে বাধ্য করে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের একনিষ্ঠ খাদেম সংযুক্ত আরব আমিরাতের গালে প্রচণ্ড থাপ্পড় মারা হয়। কিন্তু দেশটি সুজ্ঞান ও সুরুচির কারণে যুদ্ধ জয় ছাড়াই নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়।

ভারত সফরে পরমাণু নীতির ব্যাপারে দ্বৈতনীতিমূলক চুক্তি স্বাক্ষর শেষে ফিরে আসার ঠিক পর পরই নোংরা ব্যাপারটি ঘটে। বছরের পর বছর পরমাণু অস্ত্র বিস্তাররোধের কথা প্রচারের পর মার্কিন প্রশাসন ভারতকে পরামাণু জ্বালানি দিতে রাজি হয়েছে। ভারতের পরমাণু অস্ত্র উৎপাদনের ব্যাপারে চোখ বন্ধ রাখলেও পুরনো মিত্র পাকিস্তানের সঙ্গে এধরনের চুক্তিতে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ভারতে পরমাণু অস্ত্র তৈরি সঠিক হলেও মুসলিম দেশ পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা অগ্রহণযোগ্য। ভারত আন্তঃমহাদেশীয় এবং সমুদ্র থেকে নিক্ষেপনযোগ্য পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বানানোর চেষ্টায় মার্কিন সহায়তা পেলেও পাকিস্তানকে এক্ষেত্রে আবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। এমনকি তার পরমাণু স্থাপনার উপর হামলার হুমকিও দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট সে দেশের ইহূদি লবির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে পরামাণু কর্মসূচির জন্য ইরানের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। যদিও ইরানে এধরনের অস্ত্রের অস্তিত্ব আছে কিনা, তা নিয়ে সবাই সন্দিহান। কিন্তু ভারতের কাছে নিক্ষেপনযোগ্য একশর মতো পরমাণু বোমা এবং ইসরঈলের কাছে এধরনের দু'শো বোমা রয়েছে। মুসলিমবিশ্বকে শায়েস্তা করতে গিয়ে 'দুর্বৃত্তচক্রের' পরমাণু শক্তিধর উত্তর কোরিয়াকে বাধ্য করার কথা ভুলে গেছে ওয়াশিংটন। কল্পিত পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র ইরাককে আক্রমণ করা বাস্তবে এ অস্ত্রধারী রাষ্ট্রকে (উত্তর কোরিয়া) আক্রমণ করার চেয়ে অবশ্যই নিরাপদ!

ভারত থেকে ফিরে আসার পর অম্লান বদনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পুনরায় পরমাণু অস্ত্র বিস্তাররোধের প্রয়োজনীয়তা দাবি করতে থাকলেন। এর কয়েকদিন পর বিবিসি জানালো, ১৯৬০-এর দশকে গোপনে বৃটেনের সরবরাহ করা পরমাণু উপাদানের সাহায্যে ইসরঈল এ-জাতীয় বোমা প্রথম তৈরি করে। পরে তারা তৈরি করে হাইড্রোজেন বোমা। আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে, পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরক ক্ষমতা বাড়ানোর বিরল উপাদান *ট্রিটিয়াম* ব্যবহারের বৃটিশ প্রযুক্তি ইসরঈল পরে ভারতের কাছ বিক্রি করে দেয়। অস্ত্র বিস্তাররোধে বৃটেনের উন্নাসিক প্রধানমন্ত্রী যখন ইরাকের কথিত গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ব্যাপারে উপদেশ আওড়ান, তখন অনেকেই তাতে মজা পান। তার নৈতিকতা যুক্তরাষ্ট্রের

ইরাক দখলের সময় গণমাধ্যমে প্রচারিত রসিকতাগুলোর কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। 'আমরা অবশ্যই জানি ইরাকের কাছে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র আছে! এটি প্রমাণ করবার মতো কাগজপত্রও আছে আমাদের কাছে!!'

১৯৯০ সালের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো ইরাক আক্রমণ করলে বাগদাদ থেকে ভয়ঙ্কর ওই যুদ্ধের নিয়মিত খবর পাঠাতেন কানাডিয়ান বৃটিশ সাংবাদিক *এরিক রস*। তিনি এক চমকপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। 'সেখানে আমি চার বৃটিশ টেকনিশিয়ানকে খুঁজে পাই। যারা প্রমাণাদিসহ আমাকে এক স্মরণীয় গল্প বলেছিল। বৃটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ চার টেকনিশিয়ানকে ইরাকে পাঠিয়েছিল। যাদের কাজ ছিল, অ্যানথ্রাক্স, কিউ-ফিভার, টুলারেমিয়া ও বটুলিজম ছড়ানোর মাধ্যমে ইরাকে জীবাণু যুদ্ধাস্ত্র গড়ে তোলা। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পূর্ণ অনুমতি নিয়ে আমেরিকার মেরিল্যান্ডের একটি ল্যাবরেটরি থেকে এসব জীবাণু তাদের সরবরাহ করা হয়। বৃটিশ এ বিজ্ঞানীরা বাগদাদের কাছে *সালমান পার্কের* একটি অতিগোপন ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন। তারা এ প্রাণঘাতী জীবাণুকে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের স্থিতিশীল পর্যায়ে নেওয়ার মতো অগ্রগতি ঘটাতে পারেননি। তবে এ টেকনিশিয়ানদের সবাই জোর দিয়ে বলেছেন, ইরাক-ইরান যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ইরাক এ জীবাণু অস্ত্র বানাতে চেয়েছিল। তাই ইরাকে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ 'গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র' ছিল বৃটেনের সরবরাহকৃত! এধরনের ভন্ডামি সত্যিই শ্বাসরুদ্ধকর। এর জন্য আপনাকে একধরনের ছদ্মাবরণ পরতে হবে এবং তা খুলে ফেলতে সর্বোৎকৃষ্ট বৃটিশ ইংরেজি ব্যবহার করতে হবে।'

এ গল্পের মূল শিক্ষা- আপনি যদি বন্দর চালাতে চান কিংবা আত্মরক্ষার জন্য পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হতে চান, তবে আপনার উচিত নিজের নাম পাল্টে ও'রেলি, শোয়ার্জ বা প্যাটেল রাখা এবং প্রার্থনার জন্য আপনার মুখ মক্কার দিকে ফেরানো বন্ধ করা!

CamScanner

সিক্রেট আমেরিকার গোপন মিশন

(প্রসঙ্গ : ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তসন্ত্রাস)

...পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকপ্রজাতন্ত্র ও রোমানিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের বেশ কটি দেশে অসংখ্য গোপন বন্দী শিবির পরিচালনা করে সিআইএ। সাংকেতিক পরিভাষায় এগুলোকে বলা হয়, 'ব্ল্যাক সাইট'। ইরাক, আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সন্দেহভাজন আল-কায়েদা যোদ্ধাদের গ্রেফতার করে এসব বন্দীশালায় নিয়ে আসা হয়।

নাইনটিন এইটি-ফোর উপন্যাসে জর্জ অরওয়েল যেই ইউটোপিয়ান রাষ্ট্রের বয়ান হাজির করেছেন শক্তিমানেরা সেখানে সবকিছুর হর্তাকর্তা। *ওশেনিয়া* নামের এই রাষ্ট্রে 'শক্তিই' শেষকথা। 'অতীত যার নিয়ন্ত্রণে, সে ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রা; বর্তমান যার হাতে, সে অতীতকেও নিয়ন্ত্রণ করে।' মিথ্যাকে সত্যের আদলে উপস্থাপনের ওস্তাদি ফর্মুলা হাজির করে ওশেনিয়ার শাসকগোষ্ঠী। উপন্যাসের বিপুল ও বিশাল সে পৃথিবীর সঙ্গে আজকের দিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকাংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চেনাজানা আমেরিকার বাইরে অন্য এক আমেরিকা বিপুল পরাক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বেশিরভাগ মানুষের দৃষ্টির সংগোপনে। ১২৭১টি সংস্থা ও ২০০০-এরও বেশি প্রাইভেট কম্পানি সহযোগে প্রায় দশ লাখ এক্সপার্ট রাত-দিন চালিয়ে যাচ্ছে তাদের গুপ্তসন্ত্রাস-কর্মযজ্ঞ। বিপুল নিরাপত্তার বলয়ে গড়ে তোলা এই স্বতন্ত্র গোয়েন্দা নগরীতে ৩৩টি ভবন কমপ্লেক্সের একটি জাল তৈরি করা হয়েছে, যা ২২টি ক্যাপিটাল ভবনের

সমধারণক্ষমতা সম্পন্ন। গোলকধাঁধাপূর্ণ এই দুনিয়ায় কী হচ্ছে, বাকি বিশ্বের তা জানবার তেমন সুযোগ নেই। এর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরক্ষা সদরদপ্তর পেন্টাগনের হাতে। 'কাউন্টার টেররিজমে'র (আসল সন্ত্রাস) অংশ হিসেবে গোয়েন্দা কার্যক্রমের পাশাপাশি এখান থেকে চালিত হয় *সিক্রেট অ্যাসাসিন* (গুপ্তহত্যা) মিশন। এই লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় পৌনে একলাখ সেনা কমান্ডো নিয়োজিত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৮৭ সালে বহিঃবিশ্বে গুপ্তসন্ত্রাস চালানোর জন্য 'সোকোম' নামের একটি টিম গঠন করা হয়। সেনাবাহিনীর গ্রিন ব্যারেটস, রেঞ্জার্স, নেভি সিল, এয়ার ফোর্স কমান্ডো, মেরিন ক্রুগ্স, স্পেশাল অপারেশন টিম, হেলিকপ্টার ক্রু, বোট টিম, সিভিল অ্যাফেয়ার্স পারসোনাল, প্যারা রেস্কিউ কর্মী, যুদ্ধক্ষেত্রের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার, স্পেশাল অপারেশন ওয়েদারমান- এসব কিছুর কম্বিনেশনে 'সোকোম' গড়ে উঠে।

ওয়াশিংটন পোস্টের হিসেবে, ১৯৬০ সাল থেকে বাচ্চা বুশ পর্যন্ত বিশ্বের ৭৫টি দেশে আমেরিকার বিশেষ বাহিনী নিযুক্ত ছিল। ইউএস স্পেশাল অপারেশন কমান্ডের মুখপাত্র কর্নেল *টম নাইয়ে* সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, গত বছর পর্যন্ত মার্কিন এই বিশেষ বাহিনীর অপারেশন বিশ্বের ১২০টি দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফ্লোরিডার ম্যাকডিল এয়ারফোর্স ঘাঁটিতে এর হেডকোয়ার্টার ও কয়েকটি দেশে স্থাপিত হয়েছে সাবকমান্ড। হাওয়াই, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি দেশে এর ঘাঁটি রয়েছে। উনিশটি মুসলিম ভূখণ্ডে দখলদার আমেরিকার বিশেষ বাহিনী সোকোমের গোপন ঘাঁটি আছে। এই দেশগুলো হচ্ছে- পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাহরাইন, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক, জর্দান, ইয়েমেন, কুয়েত, লেবানন, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া, কাজাখাস্তান, কিরগিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান। শত্রুর ব্যাপারে তাদের সাধারণ থিওরি, 'কিল অর ক্যাপচার'। গোপনযুদ্ধ, হাই-প্রোফাইল অ্যাসাসিন, কিডন্যাপ, রেইড, জয়েন্ট অপারেশনসহ এধরনের গোপন সন্ত্রাসী কাজে নিয়োজিত এই বাহিনী। ১৯৯০ সালের আগে এদের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার। পরে এটি ৬০ হাজারে উন্নীত হয়। *সোকোমের*

কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা নাইন ইলেভেনের পর থেকে। এসময় এর বাৎসরিক বাজেট ২.৩ বিলিয়ন (২শ ৩০ কোটি) থেকে ৬.৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়।

সিক্রেট আমেরিকায় উড়ছে টাকা

যুক্তরাষ্ট্রে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা গোয়েন্দা নেটওয়ার্কে সংযুক্ত আছে সাড়ে আট লাখ কর্মী, যার মধ্যে আড়াই লাখ প্রাইভেট কন্ট্রাক্টর। দেশটির মোট গোয়েন্দা সংস্থা ২০টি। এগুলোর জন্য বরাদ্দ আছে বিপুল অঙ্কের বাজেট। এছাড়া কিছু গোপন বাজেট আছে যা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় না। ওইসব অর্থ দিয়ে আমেরিকাপন্থী সশস্ত্র গ্রুপ তৈরি ও বিভিন্ন দেশে সরকার পরিবর্তনে অর্থ সহায়তার কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া হয়। সিআইএ, এফবিআই, এনএসএ, আইআরএস এআইএ, ডিআইএ, এনজিএ, এনআরও, এএসএ, ওএনআইসহ মোট কুড়িটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার অধীনে পরিচালিত গোয়েন্দা কার্যক্রমে আমেরিকার বাৎসরিক বাজেটের এক দশমাংশ অর্থ ব্যয় হয়। শুধু ফোনালাপ নজরদারির জন্য আছে ৩০ হাজার কর্মী। ৯/১১ পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধে এসব কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। কম করে দেখানো প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী ২০০৯ সালে এ-খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৭ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। যা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে আড়াইশ' গুণ বেশি। এই পরিমাণ অর্থ দুনিয়ার সব দেশ মিলেও খরচ করে না। সিআইএ'র অফিসিয়াল সাইটে ১৯৯৭ সালে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ২৬ দশমিক ছয় বিলিয়ন (২ হাজার ৬ শ' ৬০ কোটি) ডলার ব্যয়ের কথা বলা হয় যা ২০১৩ সালে দাঁড়ায় ৩৮ বিলিয়ন (তিন হাজার আট শত কোটি) ডলারে। সিআইএর সাবেক ডেপুটি ডিরেক্টর মেরি মারগারেট গ্রাহামের উদ্ধৃতি দিয়ে *গ্লোবাল উইকিপিডিয়া* জানাচ্ছে, সিআইএসহ গোয়েন্দা কাজে আমেরিকার বাৎসরিক বাজেট ৪৪ বিলিয়ন (৪ হাজার ৪ শত কোটি) মার্কিন ডলার।

প্রকাশ্য ও গুপ্তসন্ত্রাস

সিআইএ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী মার্কিন স্বার্থের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর গোপন নজরদারি ও আমেরিকার স্বার্থে গোপন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ১৯৪৭ সালে প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া, রাশিয়া ও ইউরোপিয় অঞ্চল, এশিয়া প্যাসিফিক, ল্যাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকা বিষয়ে সিআইএর আছে আলাদা আলাদা ব্রাঞ্চ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে উঠে সংস্থাটি। ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে মার্কিন সন্ত্রাসীদের নানা অপকর্মের কথা জানা যায়। ১৮৯০ সাল থেকে এপর্যন্ত আমেরিকা প্রায় প্রতিটি বছর কোনো না কোনো ভূখণ্ডে সন্ত্রাসে লিপ্ত ছিল। ১৯৪৪ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ বাদে মোট ১৩৭বার ভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী আগ্রাসন চালায় দেশটি। এর মধ্যে অনেকগুলো ছিল মারাত্মক প্রাণঘাতী যুদ্ধ। সেসব যুদ্ধে জীবন দিয়েছে প্রায় দেড় কোটি মানুষ। ভিয়েতনামে প্রাণহানির পরিমাণ ৫০ লাখ। ইরাক-আফগানিস্তানে তো এখনো মরছে অগুণিত মুসলিম। ব্ল্যাক আফ্রিকার দেশগুলোতে অশান্তি জিইয়ে রাখার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকারকে সাহায্য ও গোপনে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে অর্থ, অস্ত্র ও মাদকের জোগান দেওয়া সিআইএ'র কাছে কানামাছি খেলা। যার ফলে আফ্রিকার গৃহযুদ্ধ চিরন্তন ও অনিষ্পত্তিযোগ্য হয়ে উঠেছে। দেশে দেশে সামরিক অভ্যুত্থান, ফ্যাসিস্টদের পৃষ্ঠপোষকতাসহ নানা অপকর্মে জড়িত এই সংস্থাটি।

১৯৫৪ সালে গুয়েতেমালায় নির্বাচিত অরবনেজ সরকারকে উৎখাত করে সিআইএ। ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক তেল সম্পদকে রাষ্ট্রীয়করণের উদ্যোগ নিলে তাকে উৎখাতে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দেয় পেন্টাগন। গুয়েতেমালায় কয়েক দফা সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পছন্দের লোককে ক্ষমতায় বসানো হয়। কঙ্গোতে ১৯৬০ সালে, ডমিনিকান রিপাবলিকে '৬৫-তে, একই বছরে ইন্দোনেশিয়ায়, ঘানায় '৬৬-তে, চিলিতে '৭৩-এ, '৮৩-তে গ্রানাডায়, '৯০-এর দশকে আলজেরিয়া, ২০০৪-এ হাইতি এবং সর্বশেষ ২০১৩-তে মিসরে সিআইএর প্রত্যক্ষ মদদে সেনা অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। ১৯৪৭ থেকে

৪৯ পর্যন্ত তিন বছর গ্রিসে সেনা অভিযান, ১৯৪৮ থেকে ৫৪ পর্যন্ত ফিলিপাইন ও মালয়শিয়ায়, ১৯৫০ সালে পুর্তোরিকো, ১৯৫০-৫৩ সালে কোরিয়া, '৫২-৫৯ সালে কেনিয়া, '৫৬-৬৭ সালে মিসর, '৫৮, '৮২ এবং ২০০৬ সালে লেবানন, আশির দশকে ফিলিপাইন, নিকারাগুয়া, ৬০ ও ৭০ দশকে ভেনিজুয়েলা, লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে সামরিক আগ্রাসন চালায় দেশটি। ১৯৬৩ সালে ইরাকে সেনা অভ্যুত্থান ঘটাতে বাছপার্টিকে সর্বাত্মক সহায়তা দেয় তারা। ১৯৮৭ সালে সিআইএর সহযোগিতায় আব্দুস সালাম আরেফের সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা নেয় সাদ্দাম হোসেন। ২০০৩ সালে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে সাদ্দাম সরকারকে উৎখাত করে যুক্তরাষ্ট্র। অ্যাঙ্গোলা, ডমিনিকান রিপাবলিক, নিকারাগুয়া, কিউবা, কলাম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, ফিলিপাইন, চিলি ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে সিআইএ বরবারই সক্রিয় ছিল। এসব দেশের স্বৈরশাসককে প্রত্যক্ষ মদদ যুগিয়েছে এই বাহিনী। অনেক ক্ষেত্রে তাদের হয়ে ভাড়াটে খুনির কাজও করেছে তারা। 'স্টেট অব ওয়্যার; দ্য সিক্রেট হিস্ট্রি অব দ্য সিআইএ এন্ড দ্য বুশ এডমিনস্ট্রেশন' বইয়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন *জেমস রিজেন*।

অপকর্মের লীলাভূমি

ওয়াশিংটন ডিসির বাইরে স্থাপিত আমেরিকার গোয়েন্দা জগতের রাজধানী নিয়ে *ওয়াশিংটন পোস্টের* একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট থেকে এবার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক। 'ওয়াশিংটনের বাইরে শহরতলীতে কিছু বাড়ি আছে, বাহির থেকে বোঝার উপায় নেই ওগুলো আসলে মানব বসতি না অন্যকিছু? সাদা চোখে জনবসতি মনে হলেও ওসব আসলে অ্যাপার্টমেন্ট ভবন নয়। ইট-কাঠের তৈরি অনেক গুদাম ঘর দেখা যায়, যা আসলে গুদাম ঘরও নয়। কোথাও দেখা যায় ক্যাফে জো সাইনবোর্ড টানানো কোনো ভবন। ওটি আর যাই হোক লাঞ্চ করার মতো জায়গা অবশ্যই নয়। দুটি নিচের দিকে ঝুলানো ছাদওয়ালা ভবনের মাঝখানে ম্যানহোলের মতো ঢাকনি দেওয়া একটি বস্তু আছে, যদিও তা ম্যানহোলের ঢাকনি নয়। বরং কনক্রিটের সিলিন্ডার পরিবেষ্টিত সেই ঢাকনা

একগুচ্ছ সরকারি ক্যাবলের প্রবেশ মুখ। সেই ক্যাবল দিয়ে কি তথ্য প্রবাহিত হয় তা জানবার সুযোগ অতিঅল্প কিছু মানুষেরই রয়েছে। ফোর্ড মিডের সেনাঘাঁটির পাশে স্থাপিত এসব গুচ্ছভবনে রাতদিন কাজ করে অসংখ্য গোয়েন্দা এক্সপার্ট। এখানে আছে কয়েশ সংস্থার হেড অফিস। যদিও ভবনের আকার-আয়তন দিয়ে এই কর্মযজ্ঞের বিশালত্বের ধারণা পাওয়া যাবে না। এখানে স্থাপিত অসংখ্য টিভি মনিটর, এক্স-রে মেশিন ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট দিয়ে বিচার করলে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। এখানে কাজ করে গণিতবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক, প্রযুক্তিবিদ, ক্রিপটোলোজিস্ট, থিঙ্ক রিডার প্রভৃতি। কাউন্টার টেররিজম বিষয়ে স্পর্শকাতর তথ্য-প্রতিবেদনগুলো এরাই তৈরি করে। এখান থেকে প্রতি বছর ৫০ হাজার প্রতিবেদন তৈরি হয়, প্রতিদিন গড়ে ১৩৬টি।'

নাইন ইলেভেনের পর মার্কিন গোয়েন্দা জগতে যে ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কার আনা হয়েছে ওই প্রক্রিয়ায় ২৬৩টি সংস্থা গঠিত বা পুনর্গঠিত হয়। এদেরকে সার্পোট দেওয়ার জন্য গঠন করা হয় 'অফিস অব দি ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স' (*DNI*)। ২০০৪ সালে মার্কিন কংগ্রেস এর অনুমোদন দেয়। ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ম্যাকলিন কাউন্টির লিবার্টি ক্রসিংয়ে স্থাপিত হেড অফিস থেকে বিশ্বব্যাপী গোয়েন্দা কর্মে নিযুক্ত জগতটির তদারকি করা হয়। লিবার্টি ক্রসিং-এর যে স্থানে সংস্থাটির অফিস তা জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে লুকানোর জন্য এর আশপাশে প্রচুর গাছপালা ও ঝোঁপঝাড়ের আড়াল তৈরি করা হয়। শীত মৌসুমে গাছের পাতা ঝরে গেলে এর সম্মুখভাগে ওয়ালমার্টের দোকানপাট দেখা যায়। কিন্তু অনুমোদন ছাড়া এর কাছাকাছি গেলেই বাতাস ফুড়ে উদয় হয় কালো পোশাকধারী সশস্ত্র প্রহরীর। এখানে ১৭০০ সরকারি কর্মচারী ও ১২০০ প্রাইভেট কন্ট্রাকটর কাজ করে।

আমেরিকার গোয়েন্দা জগতের রাজধানী হোয়াইট হাউসের পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ওয়াশিংটন ডিসির দক্ষিণ ফোর্ড মিডে। এখানে তৈরি করা হয়েছে আমেরিকার সর্ববৃহৎ সরকারি স্থাপনা। ১ কোটি ৭০ লাখ বর্গফুট জায়গা নিয়ে গড়ে উঠা এই সাম্রাজ্যে ২ লাখ ৩০ হাজার অ্যাক্টিভ পারসন রাতদিন কাজ করে

যাচ্ছে। এই পরিমাণ জায়গা ২২টি কংগ্রেস ভবন কিংবা তিনটি পেন্টাগনের সমতুল্য। এই ভবন কমপ্লেক্স তৈরিতে ব্যয় হয়েছে ৩৪০ কোটি ডলার। এখানে কর্মরত এক্সপার্টদের সম্মুখে স্থাপিত আছে বিশাল বিশাল মনিটর, যেখানে প্রতি মুহূর্তে ভেসে উঠছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সচিত্র দৃশ্যাবলি। ওইসব দৃশ্য ও প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তারা নিরাপত্তার ব্যবচ্ছেদ করছে। সংস্থাটি দৈনিক ১৭০ কোটি ইন্টারসেপ্টেড কমিউনিকেশন গ্রহণ করে। ই-মেইল, বুলেটিন, বোর্ড পেস্টিং ও ইনস্ট্যান্ট ম্যাসেজ, আইপি ট্র্যাক, ফোন নম্বর, টেলিফোন কল ইত্যাদির বিশ্লেষণ করা হয় অত্যাধুনিক সফটওয়ারের মাধ্যমে। এভাবে চিহ্নিত করা হয় আমেরিকার গোপন শত্রুকে এবং ওই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা পৌঁছে যায় সংশ্লিষ্ট স্থানে নিযুক্ত গুপ্তসন্ত্রাসী সেলে। এভাবে সমন্বয় সাধিত হয় গোয়েন্দা কর্মীর তথ্য-উপাত্ত ও গোপন বাহিনীর গুপ্ত অভিযানের মধ্যে।

দূতাবাস; গুপ্তচরবৃত্তির আখড়া

বিশ্বব্যাপী মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলো ব্যবহৃত হয় গোয়েন্দাগিরির কাজে। এসব দূতাবাসে কর্মরত স্টাফদের বেশিরভাগই সিআইএ বা অন্য গোয়েন্দা সংস্থার লোক। কূটনৈতিক পরিচয়ের কাভারে এরা সংশ্লিষ্ট দেশে গোপন কার্যক্রম চালায়। লিবিয়ার বেনগাজিতে ২০১২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যে মার্কিন মিশনে হামলা চালানো হয়, সেটি ছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর একটি গোপন তৎপরতা কেন্দ্র। *ওয়ালস্ট্রিট জার্নালে* প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। ওই হামলায় রাষ্ট্রদূত ক্রিস স্টিভেন্সসহ চার গোয়েন্দা নিহত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'হামলার পর বেনগাজি থেকে সরিয়ে নেওয়া ৩০ মার্কিন কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র সাতজন পররাষ্ট্র দফতরে কাজ করতো। হামলায় নিহত দুই নিরাপত্তা কন্ট্রাক্টর সাবেক নেভি সিল সদস্য *টাইরোন* উডস ও *গ্লেন ডোহার্টি* কাজ করতো সিআইএ'র হয়ে।'

গুপ্তহত্যার নান্দনিক অলঙ্করণ; 'এক্সিকিউটিভ অ্যাকশন'

সিআইএ'র বেআইনী গোয়েন্দা তৎপরতা সংক্রান্ত নথি থেকে জানা যায়, ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে বহু বিদেশি নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল সিআইএ। এই অপারেশনগুলোর কোড নাম, 'এক্সকিউটিভ অ্যাকশন'। জনগণের সঙ্গে 'সামাজিক যোগাযোগের' অংশ হিসেবে প্রকাশিত ৬৯৩ পৃষ্ঠার মার্কিন গোপন নথিতে কঙ্গোর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ও দেশটির নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিস লুমুম্বা এবং পানামার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওমর তারিককে হত্যায় মাফিয়ার সাহায্য নেওয়ার উল্লেখ রয়েছে। ডমিনিকান রিপাবলিকের একনায়ক রাফায়েল ট্রুজিল্লোর বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয় ওই গোপন নথিতে। যেই ভিন্নমতালম্বী ডমিনিকান রাফায়েলকে গুলি করে, সে সিআইএ'র এজেন্ট ছিল বলে জানা যায়।



লিথুনিয়ার এধরনের গুদামঘরে সিআইএ নিকৃষ্ট ব্ল্যাকসাইট চালাতো। ছবি : এপি।

গুপ্তহত্যায় নতুন মাত্রা

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে একের পর এক ব্যর্থতা ও বহু দেশে সামরিক আগ্রাসনের কারণে সমালোচনার মুখে ওবামা প্রশাসন এখন ভয়ঙ্কর পন্থা বেছে নিয়েছে। পত্রিকার তথ্য বিবরণী অনুযায়ী যাকে বলা হয়, 'দ্য ডিসপজিশন

ম্যাট্রিক্স'। আমেরিকার জন্য হুমকি বিবেচিত ব্যক্তিকে সুযোগ পাওয়া মাত্রই কিল ম্যাট্রিক্সের অন্যতম পলিসি। ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের ১৬ পৃষ্ঠার একটি দলিল প্রকাশ করে *এনবিসি নিউজ*। ওই দলিলে ড্রোন হামলার আইনি বৈধতা দিয়ে বলা হয়, 'আসন্ন হুমকি মোকাবেলায় সন্দেহভাজনকে যদি গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে। এমনকি যদি সে আমেরিকার নাগরিকও হয়!' একথার সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, মার্কিন স্বার্থের প্রতি হুমকি মানেই ড্রোন অ্যাটাক। অপহরণ করে বিচারের মুখোমুখি করার চাইতে হত্যাকাণ্ডে বেশি উৎসাহী এসময়ের খুনিরা। এর প্রমাণ, ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক ইমাম আনওয়ার আল-আওলাকি। শায়েখ আওলাকিকে হত্যা করতে মার্কিন সিনেটে আইন সংশোধন করে বিল পাস করা হয় এবং পেন্টাগনের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত ড্রোন হামলার মাধ্যমে ইয়েমেনে তাঁকে শহীদ করা হয়।

বর্বরতার নাম গোপন জেল

নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট অনুযায়ী, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকপ্রজাতন্ত্র ও রোমানিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের বেশ কটি দেশে অসংখ্য গোপন বন্দী শিবির পরিচালনা করে সিআইএ। সাংকেতিক পরিভাষায় এগুলোকে বলা হয়, 'ব্ল্যাক সাইট'। ইরাক, আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সন্দেহভাজন আল-কায়েদা যোদ্ধাদের গ্রেফতার করে এসব বন্দীশালায় নিয়ে আসা হয়। এরপর স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে চালানো হয় চরম অমানবিক নির্যাতন। এ নিয়ে মানবাধিকার সংস্থাগুলো চিৎকার-চেচাঁমেচি করলেও তা কানে তুলেনি পেন্টাগনের কর্তারা।

লিথুনিয়ায় গোপন জেলে নির্যাতনের সংবাদে পদত্যাগ করতে হয়েছিল দেশটির গোয়েন্দা প্রধান পোভিলাস মালাকাউকাসকে। অথচ ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে যখন তদন্ত শুরু হয়, সিআইএ তখন নির্দ্বিধায় সবকিছু অস্বীকার করে। লিথুনিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াস থেকে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে

ওই বন্দী শিবিরে ২০০৪-০৫ সালে সন্দেহভাজন আল-কায়েদা বন্দীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। লিথুনিয়ার জনসাধারণের অগোচরে গোপন এই *ব্ল্যাক সাইটটি* পরিচালনা করে সিআইএ। বুশের সম্মতি নিয়ে পোল্যান্ড ও রোমানিয়াতেও বন্দী শিবির চালায় সিআইএ। *কাউন্সিল অব ইউরোপ ইনভেস্টিগেটরের* প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ২০০১ সালের গোপন চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় সরকারগুলো আগে থেকেই এসব ব্ল্যাক সাইট সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। পোল্যান্ডের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান আলেকজান্ডার কোয়াসিয়েস্কি, রোমানিয়ার সাবেক নেতা ইওন লিয়েস্কু ও রাষ্ট্রপ্রধান ট্রায়ান বাসেস্কু এসব গোপন কর্মকাণ্ডে আগাগোড়া সম্পৃক্ত ছিলেন। গোপন জেলে বন্দী আনা-নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো গুপ্ত বিমান ঘাঁটি। ৯/১১ পর আমেরিকা আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালালে ওই সময় কাবুল থেকে গোপন ফ্লাইটে এসব ব্ল্যাক সাইটে উড়িয়ে আনা হয় বিন লাদেনের অন্যতম সহযোগী শেখ আবু জুবায়দা ও শেখ খালেদ মোহাম্মদকে। ওই সময় কমপক্ষে চারটি বিমান দশবার পোল্যান্ডে টেক অফ করে যার মধ্যে আটটি ফ্লাইট এসেছিল কাবুল থেকে।

যুদ্ধের ধরনে এসেছে পরিবর্তন

আগে যেসব প্রতিষ্ঠান তৈরি করতো অতিকায় যুদ্ধ বিমান ও সাবমেরিন এখন সেখানে তৈরি হচ্ছে, অত্যাধুনিক সফটওয়ার। লক্ষ্য, শত্রু দেশের যাবতীয় তথ্য হাতিয়ে নেওয়া বা তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অকার্যকর করে দেওয়া। মাত্র একজনের পক্ষে প্রতি মুহূর্তে লাখ লাখ ডাটা যাচাই এখন বেশ সহজ। অত্যাধুনিক টেকনোলজি একে সম্ভব করে তুলেছে। প্রাযুক্তিক উন্নয়নের এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত আছে বেশ কটি নামীদামী প্রতিষ্ঠান। যেমন- জেনারেল ডাইনামিক্স। এরা তৈরি করছে কৃত্রিম উপগ্রহ, ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন, সারভিল্যান্স এক্সপার্ট ইত্যাদি। ২০০০ সালে কম্পানিটির জনবল ছিল ৪৩,৩০০ যা ২০০৯ সালে ৯১,৭০০-এ দাঁড়িয়েছে। কম্পানিটির আয় ২০০০ সালের এক হাজার কোটি ডলারের জায়গায় ২০০৯ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ১শ' ৯০ কোটি

ডলারে। সিক্রেট আমেরিকায় গোয়েন্দা কম্পানিগুলোর মধ্যে জমজমাট অবস্থা আইটি কম্পানিগুলোর। ৮শ'র বেশি আইটি কম্পানি কাজ করে সিক্রেট আমেরিকা প্রকল্পে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রণের নানান প্রযুক্তি পণ্য তৈরি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পুঁজিবাদের কল্যাণে সেসবের বিপণনও চলছে দেদার। উন্নত প্রযুক্তির প্রতি সহজাত আকর্ষণ থেকে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে ওইসব গ্যাজেটে। এবং এভাবে গোয়েন্দা এক্সপার্টদের পাতানো ফাঁদে জড়াচ্ছে মানুষ।

ফলাফল শূন্য

বিশাল আয়োজন ও বৃহৎ বাজেট দিয়ে যে সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছে তা নিরাপত্তার কতটুকু নিশ্চয়তা দিচ্ছে সাপের মাথা আমেরিকাকে? সাম্প্রতিক বোস্টনে অ্যাথলেট হত্যাকাণ্ডে বিষয়টি আবারো সামনে এসেছে। প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, *এলিট টিম* বা বিপুল গোয়েন্দা কর্মযজ্ঞের সাফল্য নিয়ে। মার্কিনীদের মনে তাই সংশয়, বিশ্বব্যাপী ভঙ্গুর পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যের সুরক্ষায় কতটুকু কাজ দিচ্ছে বিলিয়ন ডলারের এতোসব প্রকল্প? এই জিজ্ঞাসা বিস্ময়কর হয়ে দেখা দেয়, খোদ ওই বাহিনীর একজন মেজর নিদাল হাসানের আল-কায়েদা নেতা আওলাকির সঙ্গে গোপন যোগাযোগের গোয়েন্দা-তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতায়। সারমায়েভ ভাইদের হামলা বিষয়ক গোয়েন্দা ব্যর্থতাও বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখে গিয়েছে।

ইরাক-আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইয়েমেনে আমেরিকার অব্যাহত পরাজয় বুঝিয়ে দেয় বিপুল ও বিশাল কর্মযজ্ঞের সীমাবদ্ধতা। নাইন ইলেভেনের পর আমেরিকার নিরাপত্তা-সুরক্ষা ব্যয় বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ডলারে ঠেকলেও প্রতিনিয়তই ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছে দেশটির নিরাপত্তাবলয়। আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ সংগঠনগুলো আমেরিকার জন্য বরাবরের মতোই সামরিক হুমকির কারণ হয়ে রয়েছে। আমরা জানি, বালির বাঁধ পতন রুখতে পারে না। সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাসে আগ্রাসী জালিমের পতন অবিশ্যম্ভাবী। আধুনিককালে বৃটিশ, ফরাসি ও স্প্যানিশ উপনিবেশ ভেঙে পড়েছে। একই পথে রাশিয়ার উত্থান-পতন

দেখেছে বিশ্ব। হাজার বছরের অগ্নিউপাসক পারসিক সভ্যতার দিন ফুরিয়েছে। দাপুটে রোমানরাও গেছে। কনফুসিয়াস ও মায়ানদের দিন তো শেষ হয়েছে আগেই। কোটি মানুষের অস্তি-মজ্জায় স্ফীত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যদিও বাঁচবার আশায় দিশেহারা হাত-পা ছুড়ছে, ব্ল্যাক আফ্রিকা থেকে ইয়েমেন, রেড ইন্ডিয়ান থেকে বিন লাদেন- তার মৃত্যু ঘণ্টা বেজেই রয়েছে। আজ অথবা আগামীকাল, তাকে যেতেই হবে। দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ...।

নষ্ট সভ্যতার আর্তনাদ

(প্রসঙ্গ : *পশ্চিমা সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতা*)

...এর মানে এই নয়, বিয়েযোগ্য স্বামীর অভাব সেখানে। বরং, খণ্ডকালীন, সাময়িক ও মেয়াদী স্বামী পাওয়া যাচ্ছে বেতনভিত্তিক। চাইলে বদলানো যাচ্ছে যখন-তখন। নারী পাল্টাচ্ছে পুরুষ, পুরুষ পাল্টাচ্ছে নারী। পুরো পশ্চিম জুড়েই চলছে এই অদল-বদলের খেলা।

একসময় কান পেতে পশ্চিমের আর্তনাদ শুনতাম। কিন্তু এখন কান পাততে হয় না। সচরাচর শুনি পশ্চিম আর্তনাদ করে চলেছে। এই আর্তনাদ বাঁচাও বাঁচাও রবে চিৎকার ধ্বনি নয়, হতাশা থেকে জন্ম নেওয়া হাহাকারও নয়। এই চিৎকার অতলান্তিকে হাবুডুবু খাওয়া অশুভ দানবের বিশ্বকে গ্রাস করার শেষ চিৎকারধ্বনি। হাত-পা ছুড়ে দানব সমানে চিৎকার করছে। ধ্বংসের ভগ্নস্তুপ থেকেও তার পাশবিক জিহ্বা শান্তিপ্রিয় মানুষের দিকে লকলকিয়ে ধেয়ে চলেছে। বিশ্বকে শেষ করে তবেই সে ক্ষান্ত হবে!

পশ্চিম অদ্ভূত এক জগত। আধুনিকতার নামে যেখানে নগ্নতার মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমের বিস্ময়কর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নারী-পুরুষে সমকামিতা, উভকামিতা আর লিঙ্গ পরিবর্তনের যেন হিড়িক লেগেছে।

ধর্মালয় মানুষের শুদ্ধতা ও সুস্থতার লালনকেন্দ্র। অসুস্থ মানসিকতায় আক্রান্ত পাপী ধর্মালয়ে যায় শুদ্ধ হতে। অস্থির আত্মা শান্তি খোঁজে ধর্মাঙ্গনে। ধর্ম মানুষকে পরিশীলিত করে। দেয় শান্তি ও স্বস্থির অনুসন্ধান। ধর্ম মানুষের ভেতরে লালিত অশুভ ও অসহিষ্ণু চেতনাকে দুরীভূত করে বিশুদ্ধতার মোড়কে। ভালো,

কল্যাণ, সম্প্রীতি এসব কিছুর চর্চা করে ধর্ম, চর্চা হয় ধর্মাঙ্গনে। কিন্তু যে ধর্মালয় পতিতাপালনের কেন্দ্র হয়, বেশ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়, সে ধর্ম ও সভ্যতার আর কি অবশিষ্ট থাকে? কি পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষা করে? আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, যে গির্জায় যৌনতার চর্চা হয়, প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য গির্জাকে মনে করে নিরাপদ, ওদের কী অবস্থা?

পশ্চিমের গির্জার অন্ধকার দিক বাইরের দুনিয়া কমই অবগত। এসব খবর বাইরে আসে না। সচেতনভাবে আসতে দেওয়া হয় না। সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ রাহিমাহুল্লাহ 'আমার দেখা আমেরিকা'[১] বইয়ে লিখেছেন, 'পাশ্চাত্যে যুবকেরা প্রেমিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও যৌনতার জন্য গির্জায় গিয়ে মিলিত হয়। গির্জা হলো প্রেমের অভয়ারণ্য।'

আবদুল্লাহ আযযাম শহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে সমাজে ঘুণ ধরেছে এবং তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, সে সমাজের অবস্থা এমন নাজুকই হয়।'

ঈশ্বরের কৃপা পেতে যে মেয়েকে গির্জার নামে উৎসর্গ করে দেওয়া হয়, পশ্চিমে তারা পরিণত হয় গির্জার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। বাইরের দুনিয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ। তাদের আছে বিশেষ সামাজিক মর্যাদা। তাদের দিকে সরু চোখে তাকানো অন্যদের জন্য নিষেধ। গির্জার বাইরে কারো সঙ্গে তারা মিশতে পারে না অবাধে। কিন্তু ভিন্ন জগতের জন্য নিষিদ্ধ এ নারীরা নিজেরাই বাস করে 'নিষিদ্ধপল্লীতে'। মার্কিন উচ্চআদালতে দায়ের করা এক নানের আর্জিতে বলা হয়েছে, কিভাবে কামুক পাদ্রীরা কুমারী নানদের উপর পাশবিক আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে! পাশ্চাত্যের আদালতে এরকম হাজারো আরজি পড়ে আছে নিষ্পত্তির অপেক্ষায়।

---

১ উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ মিসর সরকারের শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে দু'বছর আমেরিকায় ছিলেন। 'আমার দেখা আমেরিকা-আমেরিকা আললাতি রায়াইতু' এ বইটি ছাপা হয়নি। কথিত আছে, বৈরুতের প্রেস থেকে আমেরিকান এম্বেসির লোকেরা বইটির পাণ্ডুলিপি চুরি করে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে। রিসালা সাময়িকীতে তার কিছু অংশ ছাপা হয়েছিল।

পশ্চিমে জনসমাজ (বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে) কথিত স্বাধীনতার উন্মাদনায় মেতে আছে। এসব দেশে (পাশ্চাত্যানুসারী দেশগুলোতেও) বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া তরুণী ও যুবতীরা মিনিস্কার্ট নামে অদ্ভূত একখণ্ড কাপড় পরে, যা হাঁটুর উপরও বেশ খানিকটা উন্মুক্ত থাকে। অথচ এরা নারী। উদ্ভীন্না যৌবনা রূপসী। এছাড়াও দুই চিলতে কাপড়ধারী অগুনিত নারীর দেখা মেলে রাস্তায়, শপিংমল বা সৈকতে। উস্তাদ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ তফসিরে বলেছেন, 'একবার আমি *ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে* (*East University*) সফরে গিয়েছি। আসরের ওয়াক্ত। বাথরুমে গেলাম অযু করতে। দেখি, কোনো বাথরুমে দরজা নেই। পুরুষেরও নয়, নারীদেরও নয়। সবগুলোর একই অবস্থা। এটি কিভাবে হতে পারে!? কিভাবে সম্ভব!?'

পাশ্চাত্যে ২ কোটি ৫০ লাখ সমকামী রয়েছে। শুধু নিউইর্য়কের এক তৃতীয়াংশ লোক সমকামী। শায়খ আহমদ দিদাত লিখেছেন, 'তাদেরকে সুভাষিত করে আখ্যায়িত করা হয় 'গে' নামে। *Gay* মানে *আনন্দ*। অথচ শব্দটি এখন নোংরা-অশ্লীলতায় ভরা, ভদ্রসমাজে উচ্চারণ অযোগ্য।'

পাকিস্তান শরিয়া কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি তাঁর ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থে পশ্চিমের সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্ধকার দিকটি তুলে ধরেছেন। মুফতি সাহেব লিখেছেন, 'শুধু বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে নয়, আলোকিত সড়ক, জনাকীর্ণ মার্কেট, ট্রেন, বাস ও পাবলিক প্লেসে সর্বসাধারণের সম্মুখে চুম্বন, আলিঙ্গন ও জৈবিকস্বাদ উপভোগ তাদের জন্য খুব সাধারণ ব্যাপার। সারাদিনে এরকম পাঁচ-সাতটি দৃশ্য ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় চোখে পড়বে। নারীদের নগ্নতা নিন্দনীয় নয়, বরং গর্বের বিষয়। তাদের দেহে কাপড় নামে যা কিছু থাকে, লজ্জা নিবারণের দৃষ্টিতে তার যৌক্তিকতা নেই। নির্দিষ্ট স্থানে উলঙ্গ হওয়াও দূষণীয় নয়। বিলবোর্ডে *Nude Dancers* (উলঙ্গ নর্তকী)-র বিজ্ঞাপন যত্রতত্র চোখে পড়ে। ন্যুড পোস্টার ও হ্যান্ডবিল প্রকাশ্যে বিতরণ করা হয়। নিউইয়র্কের একটি বাজার অতিক্রমকালে এধরনের একটি *হ্যান্ডবিল* আমাদের ন্যায় মৌলবীদের হাতেও গুঁজে দেওয়া হয়। কয়েকটি নগ্ন ছবির সঙ্গে তাতে বড়ো করে লেখা ছিল- *Play with our bodies*! এটি কি একজন ভদ্রলোকের

পাঠযোগ্য? জৈবিক চাহিদা পূরণে এই জাতি নিঃসন্দেহে কুকুর-বিড়ালের পর্যায় অতিক্রম করেছে। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, নারী যে সমাজে এতো সস্তা যেখানে অনৈতিক যৌনাচারের জন্য নির্জনতাও আবশ্যক নয়, স্বেচ্ছাব্যভিচার আইন ও সমাজ বা বিবেকের দৃষ্টিতে কোনোরূপ নিন্দাযোগ্য নয়, এই সমাজে বলপূর্বক ধর্ষণের এতো বেশি ঘটনা ঘটে, তার সঠিক পরিসংখ্যানও নেই।'

আমেরিকার খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী *মাইকেল প্যারেন্টি*[১] তাঁর বিখ্যাতগ্রন্থ *আগলি ট্রুথসের Hidden Hlocaust : USA- 2001* অধ্যায়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশটির কিছু গাণিতিক পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। 'যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর ৭ লাখ নারী ধর্ষণের শিকার হয়।' এ হিসেবে প্রতি ৪৫ সেকেন্ডে একজন নারী সেখানে ধর্ষিত হচ্ছে। এটি সরকারি হিসেব। যারা অভিযোগ করেন তাদের সংখ্যা। এমন কতজনই তো আছেন এসব তিক্ততা হজম করেন গোপনে-নিরবে!

পাশ্চাত্য ঈশ্বরকে যতোটুকু তুলে ধরে, শয়তানকেও ততো ঊর্ধ্বে তুলতে দ্বিধা করে না। *জিমি সোয়াগট* নামের যাজক সাহেব তার সমকামী বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ *Homo Sexuality*-তে লিখেছেন, 'আমেরিকা! ঈশ্বর একদিন তোমার বিচার করবেন (অর্থাৎ, ঈশ্বর তোমাকে ধ্বংস করবেন)। তিনি যদি তোমার বিচার না করেন, তবে তাকে সেসব দুঃশ্চরিত্রবানদের নিকট ক্ষমা চাইতে হবে, বিকৃত রুচি ও সমকামিতার জন্য তিনি যাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন।'

পঞ্চাশের দশকের ইংল্যান্ড নিয়ে একজন ইংরেজ লেখক- *জর্জ র‍্যালি স্কট* 'বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'পেশাদার নারীদের বাদ দিলেও আরেক শ্রেণির নারী আছে। এদের সংখ্যাও দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। তারা তাদের আয়-উপার্জন বাড়ানোর জন্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এটি এখন মেয়েদের ফ্যাশন। বিবাহের পূর্বে অপরের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন তাদের দৃষ্টিতে

---

১ ক্রুসেডার মার্কিনীদের দ্বিমুখী নীতির বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশের অপরাধে [!] 'মানবাধিকার' ও 'ব্যক্তিস্বাধীনতার' নিশানবরদার যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ পাচ্ছেন না।

কোনোরূপ অসঙ্কোচের বিষয় নয়।' কয়েক বছর আগে ক্যামারুনের ইউয়ান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্ব বিভাগের এক অধ্যাপক দশ বছর জার্মানিতে থেকে পাশ্চাত্যকে অভিহিত করেছিলেন 'কুকুর সভ্যতা' বলে। উক্তিটি বর্ণবাদী মনে হলেও প্রফেসরের দশ বছরের গবেষণাপত্র অধ্যয়ন করে বুঝেছি, খুব বেশি বলেননি অধ্যাপক। কুকুরের মাঝে সভ্যতা না থাক, তবুও তারা পাশ্চাত্য নয়!

পশ্চিমে যৌনতা 'আর্ট' বা শিল্প। সামাজিক উন্নতি নির্ভর করে এই শিল্পের বিকাশের উপর। তাই পশ্চিমারা অকৃপণ ও মুক্ত-উদারভাবে বিকশিত করে চলেছে তার যৌন-শিল্পকলা। মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনার ধারণাতীত উপায় ও কলা-কৌশলে বিস্তৃত হয়ে চলেছে তার বিকৃত রুচির নগ্নতা-যৌনতা। অতলান্তিক পেরিয়ে এ কামকলা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের দিকে দিকে। কালো আফ্রিকায়, মরুবালুর দুবাই কিংবা আরব সীমানাঘেঁষা মিসর অথবা আমাদের ছোট্ট ক্যানভাসের অজপাড়া গাঁয়-ও। ইন্টারনেটের বেতারে ছড়িয়ে পড়েছে তা ইথারে-ইথারে। যৌন মাতলামির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নেশার ভয়াল থাবা। পাশ্চাত্যের ব্র্যান্ডি কিংবা হুইস্কি, রাশিয়ার ভদকা মানুষের রক্তে বিষাক্ত নীল ছড়িয়ে দিচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের ডামাডোলে। পশ্চিমে এগুলো কালচার, উন্নতির সোপান! টেবিলে সাজানো কিংবা শেলফ ভর্তি সারি সারি মদের বোতল, আশপাশে গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড! পশ্চিমে এগুলো জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পরিবার বা পারিবারিক ধারণা সেখানে সেকেলে। কি দরকার অযথা কোনো নারীর, কিছু বাচ্চা-কাচ্চার দায়ভার গ্রহণ করবার! চাইলে যা এমনিতে পাওয়া যায়, দায়িত্ববোধের মধ্যে তা টেনে নেওয়ার মানে হয়?

সম্প্রতি রাশিয়া চালু করেছে, 'রেন্ট-এ-হ্যাজব্যান্ড'। স্বামীদের মজুরির স্ট্যান্ডার্ড রেটও নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথম দু'ঘণ্টা ৫০০ রুবল। পরবর্তী প্রতিঘণ্টা ২০০ রুবল। এর মানে এই নয়, বিয়েযোগ্য স্বামীর অভাব সেখানে। বরং, খণ্ডকালীন, সাময়িক ও মেয়াদী স্বামী পাওয়া যাচ্ছে বেতনভিত্তিক। চাইলে বদলানো যাচ্ছে যখন-তখন। নারী পাল্টাচ্ছে পুরুষ, পুরুষ পাল্টাচ্ছে নারী। পুরো পশ্চিম জুড়েই চলছে এই অদল-বদলের খেলা।

বিশ্বে সবচে বেশি আফিম, হেরোইন ও নেশাজাত দ্রব্য চোরাচালানে জড়িত *সিআইএ*। মাল্টি বিলিয়ন ডলারের এ মার্কেটে বেনামে আছে *সিআইএ*-র আধিপত্য। জাতিসংঘ বলছে, আফগানিস্তানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পপি চাষে সর্বকালের সব রেকর্ড ভেঙে গেছে। পপি থেকে উৎপন্ন হয় মরণ নেশা হেরোইন ও আফিম। *সিআইএ* এগুলো কালোবাজারি করে আয় করে লাখ লাখ পশ্চিমি ডলার। পরে এসব অর্থ ছড়িয়ে দেওয়া হয় ল্যাতিন আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পাশ্চাত্যপন্থী বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর মাঝে, ব্যয় হয় ইরাক ও আফগানিস্তানে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নির্মূলে। ব্যয় হয় সোমালিয়া, ইয়েমেনে। পেন্টাগনের আর্কাইভ থেকে নানা সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন নথি ঘেঁটে পাওয়া গেছে ভয়াবহ এসব তথ্য।

পশ্চিমের রক্তনেশা নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি। বছরের পর বছর গভীর অধ্যয়ন করে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছি। বিশেষ করে ৯/১১'র পর যখন পশ্চিম তার অশুভ দন্তনখরে মুসলিম উম্মাহর হৃদপিণ্ড ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল। কখনো আরবে, কখনো আজমে, পশ্চিমের থাবা বিস্তৃত হয়ে চলল। অরক্ষিত হয়ে পড়ল মুসলিমবিশ্বের প্রতীকী মানচিত্রগুলো, ইসলাম থেকে বঞ্চিত হয়েও মুসলমানরা তখনো পর্যন্ত যাতে স্বস্থির শ্বাস ফেলার অবকাশ পেতো! ধীরে-নিরবে, শত বছরে পশ্চিমের যে কর্মপরিকল্পনা মুসলিমবিশ্বকে ঘিরে, মরুআরবের বালুমাটি, তার পরিবেশ-প্রতিবেশ ঘিরে এগিয়ে চলছিল, ৯/১১'র পর হঠাৎ তা সুনামির রূপ নিল। আমি এর মূল জানার জন্য পশ্চিমকে আমার থিসিসের বিষয়বস্তু করেছি। পশ্চিমকে নিয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়ে পরিচিত হয়েছি তাদের থিঙ্কট্যাঙ্কের সঙ্গে। যারা পশ্চিমে বাস করে, পশ্চিমে খায়, চিন্তা করে পশ্চিমি মাথা নিয়ে। এমনসব লোকের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছে, যারা আকারে-অবয়বে কোনোভাবেই পশ্চিমা নয়, কিন্তু পশ্চিম থেকে আলাদা কোনো রূপ তাদের নেই। তাদের ভাষা ভিন্ন, সংস্কৃতি ভিন্ন, রঙ-বর্ণ ভিন্ন, তবুও তারা পশ্চিমের। চিন্তা-চেতনা, মনন ও কর্মের জগতে শতভাগ পশ্চিমি তারা।

আমি তাদেরকে জেনেছি-বুঝেছি, মূল্যায়ন করেছি নির্মোহ দৃষ্টিতে। তাদের রচনায় পশ্চিম কীভাবে উঠে এসেছে, তাও পর্যালোচনা করেছি, যদিও এখানে

সবিস্তার আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। নোয়াম চমস্কি, স্যামুয়েল হান্টিংটন, উরি আভনরি, এডওয়ার্ড সাঈদ, মারওয়ান কাবালান, নাগিব মেহফুজ, রবার্ট ফিস্ক... এই তালিকা বেশ দীর্ঘ। তাদের রচনা বিশ্লেষণ করেছি, জেনেছি পশ্চিমের রূপ-অবয়ব।

পশ্চিমে সাহিত্য মানে রগরগে যৌনতা। সেটি গল্প, উপন্যাস, কবিতা, থ্রিলার, এমনকি হরর কাহিনি হলেও তাতে আনুষঙ্গিকভাবে যৌনতা থাকবে। নারী দেহের বর্ণনা ছাড়া পশ্চিমে সাহিত্য অচল-নিরস! ওয়েস্টার্ন মুভির জগত দুনিয়ার সবকিছু থেকেই আলাদা। হলিউড হচ্ছে এসবের আখড়া। এসব মুভির ডায়ালগ বা চিত্রায়ন জঘন্য ধরনের অশ্লীল ও নোংরামিপূর্ণ। হল্যান্ডে নির্মিত মুভিগুলোতে আবশ্যকীয়রূপে পর্নো ক্লিপ জুড়ে দেওয়া হয়। সেখানে আছে ন্যুড টিভি, আছে বিকিনি পরা নারী দেহের নগ্ন প্রদর্শনী। পশ্চিমা টিভি চ্যানেলগুলোর এ অবাধ যৌনসম্প্রচার যেকোনো সুস্থ বিবেক ও শুদ্ধআত্মাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলবে সন্দেহ নেই। অথচ বিশ্বায়নের অশুভ থাবায় তা বিস্তৃত আমাদের ভূগোলেও।

পুরো পশ্চিমজুড়ে মানুষের পরিচয় শুধু নারী আর পুরুষে। কে পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা নিকটাত্মীয় নেই তার বাছ-বিচার। এই সমাজে বর্ণবাদী বিদ্বেষের নানা কথা হরহামেশা শোনা গেলেও যৌনতার বেলায় নেই সাদা-কালোর ব্যবধান। আছে নারী সমকামী, পুরুষ সমকামী, আছে বহুগামী। এরা সবাই বাস করে পশ্চিমে। সেখানে তাদের জন্য যথার্থ স্বাধীনতা আছে। পশুপ্রবৃত্তির সমাজ আছে। আছে ন্যুড পার্ক, ওপেন হাউস, ন্যুড মিউজিয়াম, ন্যুড কলোনি। মানুষ আদলের এই লোকগুলো যেখানে প্রবেশ করে জামা-কাপড় খুলে। পুরুষ এবং নারী!

‘ইসলাম অথবা ফ্রান্স!’

(প্রসঙ্গ : *ইসলামোফোবিয়া*)

...১৯৮৯ সালে প্যারিসের একটি স্কুলে হিজাব পরিধানের কারণে তিন মুসলিম ছাত্রীকে বহিষ্কারের ঘটনা ঘটে। এর কয়েকদিন পর ড্রেসকোডের অজুহাতে স্কুলে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে স্কুলের আঙিনা পেরিয়ে পাবলিক প্লেসে হিজাব পরিধান শুধু নিষিদ্ধ নয়, দণ্ডযোগ্য অপরাধও!

এ সময়ের ফ্রান্সে পাঁচ মিলিয়ন মুসলিমের বসবাস, যা এখন পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম জনসংখ্যা। এক শতাব্দী আগেও এদেরকে বলা হতো, উপনিবেশবাসী। ষাটের দশক থেকে তারা পরিচিত হতে থাকে অভিবাসী হিসেবে। এখন বলা হচ্ছে, নাগরিক। অভিবাসন (*Immigration*) ও একত্রিকরণ (*Intregetion*) বিষয়ে ইউরোপের রাজনৈতিক আবহ খানিকটা উষ্ণ। ইতিহাসের পাতায় ফ্রান্সে মুসলিম আগমনের তিনটি পর্যায় অতিক্রান্ত হতে দেখা যায়। এই আখ্যান একই সঙ্গে বিতর্কের ছায়াও বিস্তৃত করে। কথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ফ্রান্সে ধর্মীয় বৈচিত্র্যে সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে ওঠা কঠিন বৈকি!

ফ্রান্সের মুসলিম অধিবাসীদের কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয় এবং এর উত্তরণ বিশেষ করে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিষয়টি বিদেশ-বিভুঁয়ে কীভাবে তারা রক্ষা করে, এটি সবসময় জিজ্ঞাস্য হয়ে থেকেছে। ১৯০৪ সাল নাগাদ রাজধানী প্যারিসে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫ হাজারের কিছু বেশি। এদের মধ্যে কিছু লোক কাজ করতো মার্সেলের সাবান কারখানায়। কিছু ছিল উত্তরের কয়লাখনিতে। এদেরকে বলা হতো, ‘কাবালি’। উত্তর আলজেরিয়ার *কাবালিয়া* গোত্র থেকে এসেছিল এরা।

'অভিবাসীদের যাপিত জীবন ছিল সাধারণ ফরাসি শ্রমিকের মতো। এরা ছিল শহরমুখী। উত্তর ফ্রান্সের *লাইল শহরে* বিদেশি শ্রমিকদের আনাগোণা ছিল বেশি। শ্রমিক ইউনিয়নের পোশাক আইনের ফলে প্রবাসী শ্রমিকেরা তাদের ঐতিহ্যগত পোশাকাদি পরিত্যাগে বাধ্য হয়। স্থানীয়দের মতো বেশভুষা ধারণ করে এমনকি বিশেষ ধরনের আফ্রিকি সুতার টুপির বদলে ফরাসি হ্যাট পড়ে পুরোদস্তুর ফ্রেঞ্চ নাগরিক হয়ে যায় অনেকে। ফলে তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।' বলছেন ইতিহাসবিদ *লিন্ডা আমিরি*।

শুরুর দিকে উত্তর আফ্রিকা থেকে শ্রমিকদেরকে দাস হিসেবে কিনে আনা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স তার আফ্রিকান উপনিবেশ থেকে জোরপূর্বক লাখ লাখ কালো যোদ্ধা সংগ্রহ করে। পরে এদেরকে সম্মুখযুদ্ধে নিয়োজিত করা হয়। বাধ্যগত এসব মুসলিম যোদ্ধার কঠিন আত্মত্যাগ ফ্রান্সের জন্য এনে দেয় অভাবনীয় সাফল্য। যুদ্ধ সমাপ্তির পর ফরাসিরা উপনিবেশিক যোদ্ধাদেরকে স্বদেশে ফেরৎ পাঠানোর একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়। যদিও এ সময়ের মধ্যে ফ্রান্সে তাদের একটি অবস্থান গড়ে উঠতে দেখা যায়। কিছু কিছু শ্রমিক ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে পাকাপোক্তভাবে এখানে বসিত গাড়ে। এরা মার্সেলের অস্ত্র তৈরির কারখানায় কাজ নেয়। হাজারখানেক শ্রমিক এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। সমাজবিদ *আহমদ আবু বকর* বলছেন এসব শ্রমিকের দারিদ্র্যের কথা। 'প্যারিতে আগন্তুক এই লোকেরা এখানে থিতু হবে শুরুতে এমন উদ্দেশ্য দৃষ্ট হয়নি। জীবন-জীবিকার প্রয়োজন মেটানোর বাইরে অন্য কিছু ভাববার অবসরও তাদের ছিল না। অভিবাসীদের সব মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল উপার্জন ও স্বদেশে স্বজনের কাছে অর্থ প্রেরণে।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যারিসে মুসলিম নাগরিক ছিল পনের হাজার। এই মুসলিমদের জন্য ফরাসিরা তিনটি অপশন নির্ধারণ করে দেয়- *মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ, দেশদ্রোহিতা* অথবা *দেশান্তর*। ১৯৪৪ সালের আগস্টের শেষের দিকে ৩ হাজার যোদ্ধার আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্যারিস শত্রুমুক্ত হয়। নিহত যোদ্ধাদের মাঝে কী পরিমাণ মুসলিম ছিল আমরা হয়তো তা কখনো-ই জানতে

পারব না। কালো আফ্রিকায় জন্ম নিয়েও ফ্রান্সের জন্য অকাতরে জীবন দেওয়া এসব মুসলিমের আত্মত্যাগের সামান্য মূল্যই পরিশোধ করেছে যুদ্ধোত্তর ফ্রান্স।

ঐতিহাসিক *বেনজামিন স্টোরার* গবেষণা মতে, '১৯২০ থেকে '৫০ সাল পর্যন্ত এই ৩০ বৎসরে অভিবাসী শ্রমিকেরা ফ্রান্সে আসে পরিজনহীন নিঃসঙ্গ। এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একজন মানুষ যখন পরিবার-পরিজন ছেড়ে প্রবাসে একাকী জীবনযাপন করে, তখন তার ঘরে ফিরে যাওয়া হয় অবধারিত। কিন্তু বাচ্চা-কাচ্চা, স্ত্রী-পরিজন নিয়ে এলে তার অবস্থান হয় দীর্ঘমেয়াদী। কখনো তা তা স্থায়িত্বেও রূপ নেয়। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে এরা ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্টে উঠে। বাচ্চারা স্কুলে যাওয়া শুরু করে এবং ফ্রান্সে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ভূমিষ্ট হতে থাকে।'

ফরাসি স্কুলগুলোতে এসময় মাগরেবী ছাত্রদের আধিক্য দেখা যায়। এরা এখানে পিতৃসংস্কৃতির বিপরীতমুখী স্রোতে পতিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবে এই সংস্কৃতি তাদেরকে প্রভাবিত করে। প্রথমদিকে উত্তর আফ্রিকার দম্পতিরা অমুসলিম দেশে সন্তানদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠার ব্যাপারে তেমন সচেতন ছিলেন না। এই প্রজন্মটির বেড়ে উঠা ছিল বর্ণবাদী বিদ্বেষের সূচনার মধ্য দিয়ে যা ওই সময় বিদেশি বিশেষ করে মুসলিমদের জন্য ব্যাপক উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। এর মারাত্মক বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ১৯৭৩ সালে, মার্সেলে। কিছু দিনের ব্যবধানে খুন হন ১২ আরব নাগরিক। এর মধ্যে শুরু হয় শ্রমিক অসন্তোষ। বড়ো ধরনের শ্রমিক অসন্তোষ (ধর্মঘট) ঘটে *সানকোটরা* হোটেল শ্রমিকদের মাঝে। এসব আফ্রিকির জীবন-যাত্রার মান ছিল খুবই নিম্ন ও জঘন্য। ওই সময় শ্রমিক ইউনিয়ন ও বামপন্থী দলগুলো বিদেশিদের দাবির পক্ষে সমর্থন দেখালেও সরকার তাদেরকে গণহারে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিতে থাকে। কখনো প্রশাসনিকভাবে মুলো ঝুলিয়ে কাজে সম্মত করানো হলেও সব বিদেশিকে ফেরৎ পাঠাতে রাষ্ট্র ছিল অকপট-সংকল্পবদ্ধ।

১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট *ভ্যালরি জিসকার্ড* অভিবাসী সহায়তাকল্পে 'প্রত্যাবাসন স্কীম' ঘোষণা করেন। ৫ লাখ বিদেশিকে এর আওতায় আনা হয়। আলজেরিয়ার নাগরিকেরা ছিল এই স্কীমের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু যে শিশু এখানকার আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠছিল তার জন্য প্রত্যাবাসনের দরজা উন্মুক্ত

হলো না। কেননা, প্রত্যাবাসন প্রযোজ্য হতো শুধু নিঃসন্তান দম্পতিদের ক্ষেত্রে। এতে মা-বাবার দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। আলজেরিয়া, মরক্কো ও তিউনিস নাগরিকদের সন্তানের ফরাসি পরিচয়ে বেড়ে উঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। মুসলিম এই প্রজন্মটিকে এখনো চিহ্নিত করা হয় 'বিদেশি' হিসেবে। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশী ঝামেলা এড়াতে পারলেই তারা হাফ ছেড়ে বাঁচে। দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, বাস্তুচ্যুত এসব মানুষের পরবর্তী প্রজন্ম ফ্রান্সে এখনো আগন্তুক। রক্ষণশীলরা তাদেরকে মূলধারার বাইরে গণ্য করে আসছে।

আশির দশকের শুরুতে ফ্রান্স ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দায় পতিত হয়। ওই সময় সরকারি হাউজিং ব্যবসায় ধ্বসের ফলে গণহারে চাকুরিচ্যুতির ঘটনা ঘটে। বেকারত্বের আধিক্য সমাজে মহাসংকট তৈরি করে। বাধ্য হয়ে বহু অভিবাসী ফরাসি ত্যাগের জোগাড়-যন্ত্র করতে থাকে। ১০ জুলাই ১৯৮১ সালে দেশ জুড়ে সর্বাত্মক শ্রমিক ধর্মঘট ডাকা হয়। ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা রাস্তা অবরোধ ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। এসব বিক্ষোভ-বিক্ষুব্ধ আন্দোলনে মুসলিম শ্রমিকদের পক্ষে টানতে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো তাদের অধিকারের পক্ষে দু'চারটে কথা বলা প্রয়োজন মনে করলেও তা আসলে যথেষ্ট ছিল না। অন্যদিকে রক্ষণশীলেরা ফ্রান্সে মুসলিম অবস্থানের বিপক্ষে জোরালো প্রচারণায় নামে। অব্যাহত অপপ্রচারে অভিবাসীরা নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে থাকে।

১৯৮৯ সালে প্যারিসের একটি স্কুলে হিজাব পরিধানের কারণে তিন মুসলিম ছাত্রীকে বহিষ্কারের ঘটনা ঘটে। এর কয়েকদিন পর ড্রেসকোডের অজুহাতে স্কুলে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে স্কুলের আঙিনা পেরিয়ে পাবলিক প্লেসেও হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ এবং দণ্ডযোগ্য অপরাধ! এর জন্য জরিমানার বিধান করা হয়েছে। ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে ২০১১ সালের এপ্রিলে ফ্রান্সে প্রকাশ্যে হিজাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে ফ্রান্সে বসবাস করা বিশেষ করে মুসলিম পরিচয়ে বেড়ে উঠাকে রক্ষণশীলেরা দীর্ঘদিন ধরে সমাজের জন্য অসঙ্গতবিবেচনা করে আসছে। যাদের পূর্বপুরুষের রক্ত ও ঘামের উপর আধুনিক ফ্রান্সের অস্তিত্বের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে, সেসব মানুষের সন্তানদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও ধর্মীয় পরিচয়ে বড়ো হওয়ার পথ

এভাবে সঙ্কুচিত করে দেওয়া হচ্ছে। ইউরোপের সবচে খোলামেলা দেশ ফ্রান্সে নারী, মদ ও অবাধ যৌনাচার সমাজ ও সামাজিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সমাজে ভিন্ন স্রোতধারা তৈরি হোক তা চায় না দেশটির উগ্র ও রক্ষণশীল সেক্যুলার কম্যুনিটি। গড়পড়তা ফরাসিদের মধ্যে তাই ইসলামকে শত্রু জ্ঞান ও ক্রমবর্ধিষ্ণু ধর্ম হিসেবে তার অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়। মুসলিম নারীদের অধিকহারে সন্তান জন্মদান, স্থানীয় লোকদের ইসলামের প্রতি অনুরাগ ওই অংশটিকে সংখ্যালঘু হওয়ার মতো আশঙ্কার মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছে। এজন্য বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য, হিজাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা এবং ধর্মীয় স্বকীয়তা বজায় রেখে চলতে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করবার ভুল চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম একটি নিরোধ অপরাধ। এই অপরাধের একমাত্র প্রতিবিধান, ফ্রান্স ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া। 'হয়তো মুসলমানিত্ব, নয়তো ফ্রান্স' -দেয়ালের এই লিখনীগুলো তাদের মধ্যযুগের ইউরোপিয় বর্বরতার দিকে প্রত্যাবর্তনেরই ইঙ্গিত বহন করে। লাখ লাখ মানুষকে ধর্মত্যাগী আখ্যায়িত করে চরমপন্থী যাজক 'অটো-দ্য-ফে'র আগুনে জ্বীবন্ত দগ্ধ করার সেই কালো অধ্যায়ের পুনারাবৃত্তির মুখে কার্যত দাঁড়িয়ে আছে আজকের ইউরোপ!

নিপীড়িত উম্মাহ একদিন জাগবে

(প্রসঙ্গ : *প্রতিরোধ*)

দুদিন আগেও প্রাণ বাঁচাতে পাকিস্তানের পা জড়িয়ে রেখেছিল যেই আমেরিকা, আফগানিস্তানে লা-ওয়ারিস কুকুরের মতো মার খেয়ে পালানোর পথ ও উপায় খুঁজছিল যে আমেরিকা, একজন ঘুমন্ত মানুষকে পাশবিক জিঘাংসা নিয়ে হত্যা করে তারাই এখন হিংস্র ও জঘন্য উল্লাস করছে। খুব কাছ থেকে গুলি করে ওসামাকে শহীদ করার পর হোয়াইট হাউসে ওবামার দম্ভোক্তিও ছিল লক্ষণীয়, *আমেরিকা যা চায় তা করতে পারে*। ওসামা বিন লাদেন, তাঁর জীবন ও জিহাদ, বিশ্বব্যাপী এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া ও আল-কায়েদার ভূত-ভবিষ্যত তুলে ধরা হলো এই নিবন্ধে।

ওসামা বিন লাদেন সৌদি আরবের রিয়াদে ১৯৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতাসম্পন্ন ওসামার চোখ উজ্জ্বল, সবুজ। তাঁর বাবা মুহাম্মদ বিন লাদেন বিত্তশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। ঊনত্রিশ ছেলের মধ্যে একুশতম ওসামা। তাঁর মা ছিলেন কনিষ্ঠতমা। জন্মের কিছুদিন পরই বাবা-মায়ের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে।

ওসামা ইকোনমিক্স ও ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে পড়াশোনা করেন জেদ্দার *কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে*। এখান থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারং-এ ভর্তি হন। কিন্তু ৩য় বর্ষে এসে পড়াশোনা বাদ দিয়ে ইসলাম বিষয়ক গবেষণা ও লেখালেখি শুরু করেন। সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করেন জ্ঞাতিবোন নাজুয়ারকে। ওসামা-নাজুয়ার দম্পতির মোট এগারো সন্তান। দীর্ঘজীবনে তিনি ৪ বিয়ে করেন, ২৬ সন্তানের বাবা তিনি।

মুহাম্মদ বিন আওয়াদ বিন লাদেনের (ওসামার পিতা) উত্থান চমকপ্রদ। অতিসাধারণ অবস্থা থেকে ঠিকাদারি সাম্রাজ্যের শীর্ষে উঠেন মুহাম্মদ বিন লাদেন। সৌদি রাজপরিবারেরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন তিনি। যেকোনো ধনী আরব শেখের মতো জীবন কাটাতে পারতেন ওসামা। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে শান্ত-শিষ্ট ওসামার জীবন ইসলামি পণ্ডিতদের হাত ধরে অন্যদিকে চলল। তাঁর প্রথম দুই উস্তাদ ছিলেন মুহম্মদ কুতুব ও আফগান জিহাদের প্রাণপুরুষ শায়েখ আব্দুল্লাহ আযযাম। দু'জনই কিং আবদুল আজিজে 'সাকাফাতুল ইসলামিয়্যাহ' (ইসলামি সংস্কৃতি) পড়িয়েছেন। এটি এখানকার ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য। ১৯৮৯ সালে কিংবদন্তি সোভিয়েতবাহিনী আফগানিস্তানে লজ্জাজনক পরাজয়ের ফলে পিছু হঠার পর ড. আযযামকে পেশোয়ারে *সিআইএ* দুই পুত্রসহ হত্যা করে।

ওসামার প্রচেষ্টা ছিল নববী মানহাজের খেলাফত ও শরীয়া প্রতিষ্ঠার। আব্দুল্লাহ আযযামের সহায়তায় ওসামা প্রথমে করাচি, পেশোয়ার ও এরপর আফগানিস্তান যান। তাঁর পরিচয় হয় সোভিয়েত বিরোধী মুজাহিদ নেতাদের সঙ্গে। ১৯৮২ সালে পাকাপাকিভাবে আফগানিস্তানে চলে আসেন তিনি। সঙ্গে আনেন পারিবারিক ব্যবসার বুলডোজার ও পাহাড় খোদার যন্ত্রপাতি। দুর্গম পার্বাত্যাঞ্চলে রাস্তা বানাতে, কুচকাওয়াজ ও সেনাছাউনির জন্য জমি সমান করতে, পাহাড় কেটে সর্পিল গুহাশ্রয় তৈরিতে এসব খুব কাজে লাগে। ওসামার তখন মূলকাজ ছিল মুজাহিদ গোষ্ঠীগুলোর জন্য নতুন যোদ্ধা ও অর্থসংগ্রহ করা। সৌদি সরকার তখন এ কাজে প্রত্যক্ষ উৎসাহ দিয়েছে। মসজিদে মসজিদে ইমামেরা তরুণদের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে আফগান যুদ্ধে যেতে উৎসাহ দিতেন। প্রত্যেক মসজিদে বিরাট বিরাট কাঠের বাকশো রাখা থাকতো যুদ্ধের সমর্থনে টাকা তোলার জন্য।

১৯৮৪ সালে ওসামা পেশোয়ারে একটি কেন্দ্র তৈরি করেন। আরব দেশগুলো থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রশিক্ষণ শিবিরে যাওয়ার আগে এখানে জায়গা পেতেন। তখনো ওসামার নিজস্ব শিক্ষা-শিবির ছিল না। ১৯৮৬ সাল নাগাদ আফগানিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় সেসব শিবির তৈরি হলো। ওসামা আবদুল্লাহ আযযামের তত্ত্বাবধানে *মাকতাবুল খেদমাহ* নামের সংস্থাটি পরিচালনা

করতেন। আশির দশকের শেষের দিকে শায়েখ আযযাম একটি আরবি সাময়িকী বের করেন, *আল-কায়েদা আস-সুলবা* (*The Firm base*) নামে। সম্ভবত এটিই ভ্রূণাকারে আল-কায়েদার জন্ম। তিনি আরো পরিকল্পনা করেন, আফগানিস্তানে আগমনকারী মুহাজিরদের নিয়ে এমন একটি দল গড়ে তোলার যারা পৃথিবীর নানা প্রান্তের নির্যাতিত মুসলিমদেরকে সাহায্য করবেন। আজকের বৈশ্বিক প্রতিরোধের বীজ এভাবেই রোপিত হয়।

১৯৮৯ সালে পাকিস্তানি গোয়েন্দারা ওসামাকে সতর্ক করে দেয়, *সিআইএ* তাঁকে এবং আব্দুল্লাহ আযযামকে হত্যা করতে চায়। ১৯৯০-এ সৌদি ফিরে যান তিনি। ওই বছরই তাঁকে গৃহবন্দী করা হয়। এসময় সরকার ইসলামের পথ থেকে সরে আসছে বলে ওসামার বিভিন্ন বক্তৃতা ও চিঠি রাজপরিবারকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। শাসনব্যবস্থার পরিশুদ্ধি চেয়ে অভ্যন্তরীণমন্ত্রী প্রিন্স আসাদ বিন আব্দুল আজিজকে লেখা এক চিঠিতে ওসামা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, সাদ্দাম কুয়েত আক্রমণ করবেন। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট সাদ্দাম যখন সত্যিই কুয়েত আক্রমণ করলেন, ওসামা আবার মন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানালেন, কুয়েত মুক্ত করার যুদ্ধে তিনি মুসলিম দুনিয়া থেকে একলাখ মুজাহিদ তৈরি করতে পারেন, এদের মধ্যে অনেকেই আফগান যুদ্ধের অভিজ্ঞতাঋদ্ধ সৈনিক। কিন্তু ওসামার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সৌদি সরকার 'দেশরক্ষা' ও কুয়েত মুক্ত করার অজুহাতে মার্কিনবাহিনীকে জায়গা করে দেয় জাজিরাতুল আরবে। এতে ওসামা বিরাট ধাক্কা খান। এরপর শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমিনের ফতোয়ার আলোকে মুজাহিদদের নিয়ে আফগানিস্তান চলে যাওয়া স্থির করেন ওসামা। কিন্তু পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত। রাজপরিবারের সঙ্গে পুরনো যোগাযোগের খাতিরে কোনোরকমে পাকিস্তান যাওয়ার অনুমতি পেলেন তিনি। সেখান থেকে আফগানিস্তান এসে দেখেন, পুরনো মুজাহিদেরা নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত। দেখেশুনে সুদান চলে গেলেন ওসামা। সেটি ১৯৯১ সাল।

সুদানে নির্মাণ ও কৃষি প্রকল্পে বিশাল টাকা লগ্নি করলেন। *আল-কুদস আল-আরাবির* প্রধান সম্পাদক আব্দুল বারি আতওয়ানকে ওসামা বলেছেন, সুদানে তাঁর দুশো মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ ছিল। অকৃতজ্ঞ সুদান সরকার তার কিছুই

ফেরৎ দেয়নি। ১৯৯৪ সালে সৌদি সরকার ওসামার নাগরিকত্ব বাতিল করে। সুদানও চাচ্ছিল না, ওসামা সেখানে থাকুন। দুটি পথ খোলা ছিল তাঁর সামনে। দেশে ফিরে সারাজীবন কারাগারে বা গৃহবন্দী হয়ে থাকা অথবা আমৃত্যু ঘোষিত শত্রুর সঙ্গে লড়ে যাওয়া। সবাই জানে, দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। শায়েখ আযযাম এমন একটি বাহিনী তৈরি করতে চেয়েছিলেন, স্থানীয়ভাবে যারা জালেমদেরকে মোকাবেলা করবে। কিন্তু ওসামা স্থানীয় সমস্যার মধ্যে আটকে না থেকে বৈশ্বিক কুফরের মোকাবেলা (গ্লোবাল জিহাদ) এবং যুগের হুবাল আমেরিকাকে নিশানা বানানোর পরিকল্পনা নেন। এমনকি তাঁর চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অন্যান্য শায়েখদের চিন্তাও বদলে যায়।

সুদান থেকে আফগানিস্তানে ফেরৎ এসে ওসামার তালেবানের সঙ্গে বিশেষ সখ্য জন্মায় এবং মোল্লা ওমরের কাছে তিনি আনুগত্যের বায়াত নেন। ১৯৯৮ সালে ওসামা ও জাওয়াহিরি মিলে ইহূদি ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে *ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট* (জামায়াত কায়েদাতুল জিহাদের প্রারম্ভিকরূপ) প্রতিষ্ঠা করেন। ওই বছর ৭ আগস্ট নাইরোবি ও দারুস সালামের আমেরিকান দূতাবাসে যে বিস্ফোরণগুলো ঘটানো হয়, *ইসলামিক ফ্রন্টের* সেটিই প্রথম প্রকাশ্য আক্রমণ। যদিও এর আগে সোমালিয়াতে ব্ল্যাক হক ডাউনের ঘটনায় তাঁদের পরোক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। দূতাবাসে আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় আফগানিস্তানে আল-কায়েদার বিভিন্ন ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করে যুক্তরাষ্ট্র। কান্দাহারে ওসামার অবস্থানস্থলও তার মধ্যে ছিল। কিন্তু ওসামা বেঁচে যান।

আফগান যুদ্ধ চলাকালীন অন্তত চল্লিশবার গোলাবর্ষণের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। একবার তাঁর কুড়ি গজের মধ্যে একটি স্কাড মিসাইল ফেটেছিল। আরেকবার বিষাক্ত গ্যাস আক্রমণে প্রায় মারা পড়েছিলেন। গ্যাসের এ বিষ-প্রতিক্রিয়া গলায় মাঝে মাঝে অনুভব করতেন তিনি। একবার কান্দাহারের ঘাঁটি থেকে খোশতের দিকে রওনা দেন ওসামা। কান্দাহারের পাচকদের মধ্যে এক চর সিআইএকে খবর দেয়। যেসময় ওসামার খোশত থাকবার কথা, সেসময় সেখানে বিমান হামলা চালায় মার্কিনবাহিনী। কিন্তু ওসামা, কেউ জানে না কেন হঠাৎ পথ পরিবর্তন করে কাবুল চলে যাওয়ায় বেঁচে

যান। ২০০১-এর সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ারের পতনের পর এক বিধ্বংসী বিমান আক্রমণ হয় *তোরাবোরা* বা *সিংহের গুহা* নামে খ্যাত আফগানিস্তানের পাহাড়ি ডেরায়। সেবারও অল্পের জন্য বেঁচে যান ওসামা। পরের জানুয়ারিতে যখন আল-জাজিরার পর্দায় দেখা যায় তাঁকে, তখন তাঁর বাঁ কাঁধটা ব্যান্ডেজ থাকার দরুন ডান কাঁধ থেকে উঁচু দেখায় এবং বাঁহাতি হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায়, বাঁ দিকটি তিনি একদম নাড়ছেন না। পরে ওই বছরই অন্য এক টেলিভিশন সম্প্রচারে দেখা যায়, ইচ্ছে করেই বাঁ হাত নাড়িয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন ওসামা, তিনি সেরে উঠেছেন। বাঁ কাঁধে গোলার টুকরো লেগেছিল তাঁর। খুব সম্ভবত জাওয়াহিরি, যিনি একজন স্বনামধন্য শল্যচিকিৎসক, টুকরোটা বের করেছিলেন। ২০০৪-এর পর জনসমক্ষে কোনো প্রামাণ্য নিশ্চিত আত্মপ্রকাশ ঘটেনি ওসামার। তাঁর পলাতক জীবন ও অসমর্থিত মৃত্যুর খবর নিয়ে জল্পনা ও গাল-গুজব ছড়িয়েছে বারবার।

আফগানিস্তানে রুশবাহিনীকে মোকাবেলারত স্থানীয় মুজাহিদীনকে সমর্থন দেয় আমেরিকা। সোভিয়েতের বিলুপ্তির পর তাদের যাবতীয় হিসাব-নিকাশের ছক পাল্টে যায়। এসময় থেকে জিহাদকে 'সন্ত্রাস' ও 'উগ্রপন্থা' হিসেবে প্রচারণা শুরু হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টিভি পর্দায় টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে আগুন জ্বলতে দেখে বিস্মিত হয়ে যায় পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ। খোদ আমেরিকার মাটিতে এতো বড়ো হামলা এর আগে হয়নিও কখনো। এই হামলায় আমেরিকা বিন লাদেনকে দায়ী করে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অন্তহীন যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। বিন লাদেনকে থামানো বা তাঁর বাহিনীকে গুড়িয়ে দিতে আফগানিস্তানে পাঠানো হয় বহুজাতিক বাহিনী। কিন্তু মিথ্যা অজুহাতে ক্রুসেডারদের ইরাক আক্রমণের পর ওই প্রেক্ষাপটও বদলে যায়। বিন লাদেন সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে আসে পরিবর্তন। তারা তাঁকে দেখতে থাকেন জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মানবতার বন্ধুরূপে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কারণে নিপীড়িত মানুষের কাছে প্রকৃত নায়ক হয়ে উঠেন তিনি। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্র তাঁর মাথার মূল্য ৫০ মিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করেও ধরতে পারেনি তাঁকে।

আফগানিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তানের বহু এলাকায় মানুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও বিন লাদেনকে রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে তিনি সন্ত্রাসী নন, ছিলেন উম্মাহর স্বার্থ রক্ষায় অকুতোভয় যোদ্ধা। যেমনটি বলেছেন এক সাক্ষাৎকারে ওসামা নিজে। 'ধনী বাবার ছেলে আমি। চাইলে অন্যান্য ধনাঢ্য সৌদি নাগরিকের মতো ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় বিলাসী-জীবন কাটাতে পারতাম। আমি তা করিনি। হাতে তুলে নিয়েছি অস্ত্র, চলে এসেছি আফগানিস্তানের পাহাড়ে। শুধু কি ব্যক্তিগত লাভের আশায়, যেখানে আমার প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে মৃত্যুকে সঙ্গী করে? মুসলমানদের উপর যারা আঘাত করে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার ধর্মীয় দায়িত্ব থেকেই আমি এ পথে এসেছি। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মৃত্যু হলেও আমি তা পরোয়া করি না। আমি এবং আমার মতো আরো অনেকের মৃত্যুই একদিন এ উম্মাহকে তাদের উদাসীনতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে।'

নিজের কথা রেখেছেন তিনি। আল্লাহ তাআলা পূরণ করেছেন তাঁর সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা- আল্লাহর পথে শাহাদাত। ১ মে ২০১১ সালে অ্যাবোটাবাদের একটি বাড়িতে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে রাতের আঁধারে পরিচালিত আমেরিকার কাপুরুষোচিত হামলায় শহীদ হন মুজাদ্দিদে উম্মাহ ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর এই মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাবিশ্বে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। ঘুমন্ত ও নিরস্ত্র একজন মানুষকে গুলি করে হত্যা করে উল্লাসে মেতে উঠে আমেরিকা-ইসরঈলসহ পশ্চিমা দুনিয়া।

৮ মে (২০১১) লন্ডনের *সানডে টাইমস* পত্রিকার অধিকাংশ লেখা বিন লাদেনকে নিয়ে। লন্ডনের আরেকটি রক্ষণশীল পত্রিকা *দি ডেইলি টেলিগ্রাম* ৬ মে মূল সম্পাদকীয় নিবন্ধের হেডিং দিয়েছে- *The killing of Bin Laden is no matter of regret* (*বিন লাদেন হত্যায় দুঃখ করার কিছু নেই*)। অবশ্য এর বিপরীতে কিছু সচেতন বিবেকের ক্ষীণকণ্ঠের প্রতিবাদও দেখা যায়। লন্ডন থেকে এমন একজন লিখেছেন, *America makes the mistakes of trying to solve terrorism by their own terrorism, which is a failed us foreign policy in the Middle East.* (*টেরোরিজম'কে নিজেদের টেরোরিজম দ্বারা দমন করতে*

গিয়ে আমেরিকা ভুল করছে। এটি মধ্যপ্রাচে আমেরিকার ব্যর্থ পররাষ্ট্রনীতি)। অস্ট্রেলিয়া থেকে মার্টিন ব্লিজার্ড লিখেছেন, 'বিন লাদেন যে অসংখ্য কারণে আমেরিকাকে ঘৃণা করতেন, তার একটি হলো, ইরাকে ৫ লাখ শিশু হত্যা। এটি ইউনিসেফের হিসেব। ইরাকে আমেরিকা অমানবিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় শিশুমৃত্যুর এই ঘটনা ঘটে। আমাদের চরিত্রের ডবল স্ট্যান্ডার্ডের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, মুসলমানরা বোমা মারলে তাকে 'টেরোরিজম' বলি। কিন্তু পশ্চিমাদের মিসাইল হামলায় অসংখ্য মানুষ নিহত ও পঙ্গু হলে, তাকে বলি 'কোলেটারাল ড্যামেজ' (পরোক্ষ ক্ষতি)।'

একজন ইউরোপিয় পার্লামেন্টারিয়ান বিন লাদেন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ওসামা বিন লাদেনকে জনগণের নেতা বলে সম্বোধন করেন। বিন লাদেন হত্যাকাণ্ড নিয়ে সংশয় যতোই থাকুক, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওবামার ভাষায় 'আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন এই দুনিয়াতে আর কোনোদিন চলাফেরা করবেন না'। দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য এটি এক মিশ্রঅনুভূতি। তাঁকে গ্রেফতার করে বিচার করে সাদ্দামের মতো ফাঁসি দিলেও অন্তত বিচার ও মানবাধিকার নিয়ে মার্কিনীরা দু'চারটে কথা বলতে পারত। কিন্তু অতীতের বহু ঘটনার মতোই বরাবর তারা প্রমাণ করল, বিচার ও মানবাধিকারের সংজ্ঞা সেটি, যা তারা নিজেরা মনে করে।

জার্মানির গিসেন থেকে একজন লিখেছেন, *This was vengeance, not justice. Osama Bin Laden should have been captured and tried in a court of law with international legitimacy not the kangaroo courts Guantanamo and certainly not a summary execution.*

সানডে টাইমসে ড. মোর্টি লিখেছেন, 'সন্ত্রাসের সমস্যা তখনই দূর করা যাবে, যখন মার্কিন প্রশাসন ফিলিস্তিনিদের হোমল্যান্ড প্রতিষ্ঠায় সমর্থন জানাবে, ইসরঈলকে সমর্থন দেওয়া থেকে বিরত হবে, গুয়ান্তানামো বন্দীশালা বন্ধ করবে, মুসলিম দেশগুলো দখল থেকে নিবৃত্ত থাকবে এবং এসব সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘের প্রচেষ্টাকে বাধা না দেবে'।

ওসামার শাহাদাতের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ কি নিঃশেষ হয়ে যাবে? আল-কায়েদা, তালেবান দখলদার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পথ থেকে কি সরে

আসবে? বিন লাদেনের মৃত্যু নিয়ে ইতোমধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক বিশ্লেষকেরা নানা মত ব্যক্ত করছেন। ইসরঈলি-আমেরিকান বহু বিশ্লেষক স্বস্তির শ্বাসও ফেলছেন। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস যারা জানেন, তারা বোঝেন, ইসলামি প্রতিরোধ ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভরশীল নয়। সন্দেহ নেই, বিন লাদেনের শাহাদাত মুমিনদের জন্য বড়োসড় আঘাত। কিন্তু একথা ভুললেও চলবে না, ওসামার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সব চুকেবুকে যাবে বলে যারা ভাবছে, তারা নেহায়েত মূর্খ। তাঁর এই আত্মত্যাগ প্রতিরোধকে বরং শক্তিশালীই করবে।

সর্বশেষ রিলিজ হওয়া অডিও বার্তায় তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, *ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইয়েরা যতোদিন নিরাপত্তা না পাবে, আমেরিকা যতোদিন সন্ত্রাসী ইসরঈলের উপর থেকে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাহার না করবে, ততোদিন তারাও নিরাপত্তা পাবে না।*

ইসরঈলি প্ররোচণায় মার্কিনিরা ইরাক ও আফগানিস্তানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি ও আগ্রাসনের মূলে আছে এই জায়নবাদ-ইহূদি। জাতিগত সহিংসতা, দেয়াল নির্মাণ, চেকপয়েন্ট, সামষ্টিক শাস্তি ও সার্বক্ষণিক নজরদারি- এসব কিছুই ইহূদি উদ্ভাবন। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে ফিলিস্তিনের অধিকাংশ জায়গা চুরি করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা সফল। কিন্তু সবকিছুর পরও, ফিলিস্তিনিদের এতো ভোগান্তি সত্ত্বেও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত বিভক্তি ঘটানো যায়নি এবং সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তারা একজাতি হিসেবে টিকে আছে। ভিন্নদিকে আফগানিস্তানে একের পর এক ব্যর্থতাই বলে দেয় ওবামার পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ ও কুড়ি শতকে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিগত শুদ্ধির পথে এ দেশটি জয় করতে চেষ্টা চালায়। ভয়ানক রক্তক্ষয়ের পর তাদের বিদায় নিতে হয়। সাম্রাজ্যিক সমাধিগুলো আজো তাদের স্মৃতি বহন করছে। জনতার শক্তি বরফের নিচে রয়ে যাওয়া বীজ। আক্রমণকারীরা এই শক্তিকে খুব ভয় পায়।

পুনশ্চ : ওসামা বিন লাদেন আট বছর আগে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ শহরে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর হাতে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন আল-

কায়েদা এই আট বছরে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এখন কেমন আছে, কোন অবস্থায় আছে, তা নিয়ে *বিবিসির* একটি রিপোর্ট থেকে আলোকপাত করা হলো-

'সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আইএস সংবাদের শিরোনাম দখল করে রাখলেও, আল-কায়েদা গোপনে নতুন করে সংগঠিত হওয়ার কৌশল অবলম্বন করেছে এবং সমমনা আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে জোট তৈরি করেছে। *ইউএস ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স* সর্ব-সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলছে, 'আল-কায়েদার শীর্ষ নেতারা সংগঠনের বিশ্বব্যাপী কাঠামো জোরদার করছেন এবং পশ্চিমা দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন।' বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসের হুমকির উপর জাতিসংঘ এ বছরের গোড়ার দিকে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলছে, আল-কায়েদা আগের চেয়েও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। সংগঠনটি বহু অঞ্চলে বিস্তৃত এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেকে আরো বেশি পরিচিত করতে চাইছে। ফেব্রুয়ারি মাসে (২০১৯ সালে) বৃটিশ গোয়েন্দাপ্রধান অ্যালেক্স ইয়াং আল-কায়েদার পুনরুত্থানের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি জানায়।

মার্কিন বাহিনীর ক্রমাগত ড্রোন আগ্রাসন, শীর্ষ নেতাদের গুপ্তহত্যা এবং ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জের কারণে আল-কায়েদাকে নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হচ্ছে। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায় সংগঠনটি সফলভাবে তাদের শাখা ও সহযোগী সংগঠনের নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। এই সহযোগী সংগঠনগুলো স্থানীয় পর্যায়ে তৎপর এবং শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি অনুগত। আইএস যেমনটি করছে, আল-কায়েদা কখনই স্থানীয় জনগণের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করেনি। সংগঠনটির কৌশল হচ্ছে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে তোলা এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে আত্মনিয়োগ করা। ২০১৩ সালে আল-কায়েদা 'জিহাদের সাধারণ নিয়মাবলি' প্রকাশ করে। এতে সংগঠনে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি চালু করা হয়। তারা দুর্নীতি ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার মতো বিষয়ের দিকে নজর দিচ্ছে বলে বলছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পেমব্রোক কলেজের শিক্ষক ড. এলিজাবেথ কেনডাল। সংগঠনটি তার শাখাগুলোর মাধ্যমে হামলার সংখ্যাও বাড়িয়ে দিয়েছে। *দ্য আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডেটার* তথ্যানুযায়ী, ২০১৮ সালে আল-কায়েদা তার সহযোগী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে বিশ্বের নানা দেশে মোট ৩১৬টি হামলা পরিচালনা করে।

আল-কায়েদার শাখা : **এক.** আল-কায়েদা ইন দ্য ইসলামিক মাগরেব (একিউআইএম)। আলজেরিয়াভিত্তিক আল-কায়েদার এই শাখাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৬

সালে। **দুই.** আল-কায়েদা ইন দ্য অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা (একিউএপি) প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালে। **তিন.** আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ কেন্দ্রিক আল-কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (একিউআইএস) প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে। **চার.** জামাত নুসরাত আল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) পশ্চিম আফ্রিকা ও মালিতে আল-কায়েদার সহযোগী সংগঠন। **পাঁচ.** সোমালিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় তৎপর আল-শাবাব ২০১২ সালে আল-কায়েদার প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি দেয়। **ছয়.** আল-কায়েদার প্রতি আনুগত্যশীল সিরিয়াভিত্তিক জিহাদি সংগঠন হাইয়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) উত্তর সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ করছে। **সাত.** আল-কায়েদা ইন ইজিপ্ট মিসরের সিনাই মালভূমিতে সক্রিয়। আল-কায়েদার সমর্থক বেশ কটি দল মিলে এই গ্রুপটি তৈরি হয়েছে। এছাড়া আফগানিস্তান ও ওয়াজিরিস্তানভিত্তিক আল-কায়েদা সেন্ট্রাল বিশ্বব্যাপী সংগঠনটির সামরিক ও রাজনীতিক তৎপরতা পরিচালনা করে। চেচনিয়া, পাকিস্তানি তালেবানসহ বিশ্বব্যাপী বেশ কিছু সংগঠন আল-কায়েদার মানহাজ অনুযায়ী তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা চালাচ্ছে বলে সংবাদসূত্রে জানা যায়।'

প্রোপাগান্ডা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের এই সময়

(প্রসঙ্গ : *বিশ্বায়ন*)

...সন্দেহ নেই, ইসলামের শত্রুদের হাতে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের উপায়-উপকরণ অনেক অনেক বেশি। কিন্তু মুসলমানদের ঈমানি শক্তির মোকাবেলা করবার মতো অস্ত্র তৈরিতে তারা কখনো সমর্থ নয়। পশ্চিমাদের অব্যাহত মিথ্যাচার সত্ত্বেও ইসলামের প্রতি গণমানুষের আগ্রহ ও প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে এই বন্ধন ছিন্ন করা একেবারেই অসম্ভব।

আধুনিক যুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার *মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ*। সামরিক পরিভাষায় একে বলা হয়, *Psychological warfare* বা *ডিজইনফরমেশন ক্যাম্পেইন*। সহজভাবে বললে, *ব্ল্যাক প্রোপাগান্ডা*। প্রোপাগান্ডার অন্যতম ক্ষেত্র মিডিয়া। মিডিয়ার আশ্রয় নিয়ে *ব্ল্যাক প্রোপাগান্ডা* ডালপালা ছড়ায়। আধুনিক বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। বর্তমান সময়ে যুদ্ধকৌশল হিসেবে সচারাচর ব্যবহৃত মারণাস্ত্রের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক কৌশলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। মানুষের চিন্তা-মননে প্রভাব ফেলার মাধ্যমগুলোর মধ্যে প্রচারযন্ত্র ও যোগাযোগমাধ্যম বলা যায় প্রধান হাতিয়ার। এসব হাতিয়ারের মাধ্যমে মানসচেতনা ও চিন্তা-সংস্কৃতির উপর বুদ্ধিভিত্তিক আঘাত হানা যায় সহজে। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের কুশীলবেরা এধরনের আপাত নির্দোষ অস্ত্র ব্যবহার করেই স্থানীয় সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলোকে ধীরে ধীরে কোণঠাসা ও নির্জীব করে নিজস্ব চিন্তা-বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। মানবীয় চিন্তা-মননের উপর গণমাধ্যমের প্রভাব-ক্ষমতা এখন

সর্বস্বীকৃত। প্রাযুক্তিক উৎকর্ষ একে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। প্রযুক্তির বিকাশে মিডিয়ার সামর্থ্য তাই প্রচুর। কোনো ভূগোলই আজ অগম্য নয়। সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি এবং হাল আমলে ইন্টারনেটের বেতারে বৈশ্বিক মিডিয়াগুলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। ভৌগলিক সীমানা ডিঙ্গিয়ে এসব মিডিয়া তার নিজস্ব প্রভাবক ক্ষমতা ছড়িয়ে দিচ্ছে সর্বত্র। একালের যোগাযোগের অত্যাবশ্যক অনুষঙ্গ ইন্টারনেট। প্রায় প্রতিটি ঘরেই আছে কম্পিউটার। আছে সংযুক্ত বা বেতারের (*Wi-Fi*) নেটওয়ার্ক। কয়েক বছর আগেও ইন্টারনেট ছিল কম্পিউটারকেন্দ্রিক। সময়ের আবর্তনে তা এখন ঠাঁই নিয়েছে প্রযুক্তি পণ্যে। মোবাইল, ট্যাব হয়ে এই নেটওয়ার্কের বিস্তার ঘটেছে সর্বত্র। আশি ও নব্বই দশকের পূর্বে গণমাধ্যম ছিল জাতীয় (সরকারি মালিকানাধীন)। নিওলিবারেল পদক্ষেপের পর ব্যাপকহারে বেসরকারি ও বাণিজ্যিক রেডিও-টিভি, সংবাদপত্রের (কর্পোরেট মিডিয়া) আবির্ভাব ঘটে। বুর্জোয়া অর্থনীতি এই মিডিয়ার সঞ্জীবনীশক্তি। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বিশেষায়িত মিডিয়াগুলো। স্নায়ুযুদ্ধকালীন নিওলিবারেল পরিস্থিতিতে প্রণীত পলিসিতে বলা হয়, মিডিয়াকে পুরোদুস্তর বাণিজ্যিক হতে হবে। অর্থাৎ, ব্যবসাই শেষকথা।

...

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে জয়ী হতে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অপরিহার্য। মিডিয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা আরো গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টিতে সমর্থ না হলে জনগণ ওই মিডিয়াপ্রচারণার বিপরীত মতই গ্রহণ করবে। এজন্য মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণের ক্ষেত্রে মানুষের মন-মগজে প্রভাব ফেলা হয় সচেতনভাবে। পুঁজিবাদের নানা আয়োজনে গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব ক্রমশই বাড়ছে। তারুণ্যের মাঝে উস্কে দেওয়া হচ্ছে সহিংসতা। সমাজবিষয়ক নানা সমীক্ষায় দেখা গেছে, গণমাধ্যম সন্ত্রাস ও দাঙ্গা উস্কে দিচ্ছে। 'এন্ডার্স ব্রেইভিক' কিংবা 'লন্ডন দাঙ্গা' এসবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (হাল আমলে নিউজিল্যান্ডের *ক্রাইস্ট চার্চ মসজিদে* গণহত্যা ইসলামোফোবিক ধারাবাহিক মিডিয়া প্রচারণারই অনিবার্য ফলাফল)।

মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে লিপ্ত পশ্চিমা ক্রুসেডারদের সামনে প্রধান বাধা ইসলামি আকিদা ও উম্মাহর ঐক্য। বিশেষায়িত মিডিয়াগুলোর প্রধান টার্গেট তাই উম্মাহর উলামাশ্রেণি ও নেতৃবৃন্দ। বিশেষ করে যারা উম্মাহর উপর কুফুরির আগ্রাসন বিষয়ে শরয়ী অবস্থান প্রকাশে কুণ্ঠিত নন। এসব মিডিয়ায় প্রাথমিকভাবে উলামা ও আগ্রাসন প্রতিহতকারী যোদ্ধাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ব্যাপারগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়। এরপর কিছু কৌশলী প্রশ্ন ছুড়ে সৃষ্টি করা হয় ধুম্রজাল ও সংশয়। তারপর ধীরে ধীরে এগুলোকে ব্যাপক প্রচারণা দেওয়া হয়। টিভি, সিনেমা, ইন্টারনেটে নানান ওয়েবসাইট ও কলোনিয়ালদের পেইড কলামিস্ট দিয়ে সংবাদপত্র কিংবা অন্যান্য মাধ্যমে এসব বিষয়ে দিনে-রাতে চালানো হয় প্রচারণা। টকশো ও সংবাদবিশ্লেষণে হাজির করা হয় সামরিক আমলা ও 'নিওকন'দের। এই টকশোজীবীরা মুসলিম ভূমিগুলোতে হামলার যৌক্তিকতা তুলে ধরে। লক্ষ্যণীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে, উম্মাহর উপর চালানো সামরিক আগ্রাসন বা নিধনযজ্ঞের ক্ষেত্রে এরা সচেতনভাবে শব্দপ্রয়োগ করে। যেমন, সামরিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রে বলা হয়, 'হস্তক্ষেপ'। গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতিকে 'গোলযোগ', গণহত্যাকে আড়াল করতে বলা হয়, 'কোলেটারাল ড্যামেজ' (পরোক্ষ ক্ষতি)। পাশ্চাত্যের উদারতার সুযোগ নিয়ে মুসলিমবিশ্ব কিভাবে উগ্র হয়ে উঠছে, সে ব্যাপারেও তথ্য-উপাত্ত হাজির করে মিডিয়া নামের এই প্রোপাগান্ডা হাউজগুলো। (আমেরিকা-ন্যাটোজোটকে নিশ্চিত পরাজয়ে নাকানি-চুবানি খাওয়ানো তালেবান নিয়ে তাই তাদের সংশয়, 'এতো বোমার খই-খরচা কই পায় তালেবান!')। ইন্টারনেটে ইসলামি নামের কিছু ওয়েবসাইটের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলোতে খুব সুন্দর ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রচার করা হচ্ছে। অনুমান করা যায়, এগুলোর উৎস সব একই। এসব সাইটে পরিকল্পিতভাবে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণের কাজটি করা হয়। সাধারণ ভিজিটরদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে যাদের জানাশোনা কম অথবা একেবারে নেই, তারা এসব মাধ্যমে এসে অজান্তে প্রতারিত হয়।

পশ্চিমে আগে থেকেই হাজার হাজার রেডিও-টিভি চ্যানেল আছে। আর এখন ইন্টারনেট আবিষ্কৃত হওয়ার পর মনস্তাত্ত্বিক হামলার ব্যাপকতা রোধ প্রায়

অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ বৃহৎ গণমাধ্যম পশ্চিমা নিয়ন্ত্রাধীণ। এগুলো উন্নয়নশীল দেশের উপর প্রভাব বিস্তারে পশ্চিমের অব্যর্থ হাতিয়ার। শিল্পের নানা বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন প্রচার-পুস্তিকা, গল্প-উপন্যাস, সংবাদপত্র, রেডিও-টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো তাই তাদের জন্য খুবই সহজ। 'ডিজিটাল মার্কেটিং রাম্বলিংস'-এর হিসেবে সামাজিক নেটওয়ার্ক *ফেসবুকের* মান্থলি একটিভ গ্রাহক ১.৬ বিলিয়ন। এর মধ্যে ৬৮০ মিলিয়ন ইউজার মোবাইল থেকে ফেসবুক ব্যবহার করেন। ফেসবুকে পাতার সংখ্যা ৫০ মিলিয়ন এবং এখানে প্রায় ১০ মিলিয়ন অ্যাপ রয়েছে। বাংলাদেশে এই ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৭ লাখ (জুন ২০১৯-এ এই সংখ্যাটি ২ কোটি ৮০ লাখ)। এর মধ্যে ৭৯% ব্যবহারকারী পুরুষ, ২১% নারী। গতবছর এ নেটওয়ার্কের আয় ছিল ৫.০৯ বিলিয়ন ডলার। *গুগল প্লাস*-এ আছে ৩৮৪ মিলিয়ন এ্যাক্টিভ ইউজার। ইমেজ শেয়ারিংয়ের জনপ্রিয় সাইট *ফ্লিকারের* ইউজার ৮৭ মিলিয়ন এবং এখানে আপলোডকৃত ছবির সংখ্যা ৮ বিলিয়ন। মাইক্রোব্লগিং সাইট *টুইটারের* গ্রাহক ৫০০ মিলিয়ন, ২০০ মিলিয়ন এ্যাক্টিভ ইউজার। *ওয়ার্ডপ্রেসে* আছে প্রায় ৭৪ মিলিয়ন ব্লগ। একই সময়ে ভিডিও দেখার জনপ্রিয় সাইট *ইউটিউবের* মান্থলি ভিউয়ার ১ বিলিয়ন। এই সাইটে দৈনিক ৫ বিলিয়ন ভিডিও দেখা হয়। ভিজিট করে ৩০ মিলিয়ন ইউজার। *স্কাইপ* ব্যবহার করে ২৮০ মিলিয়ন মানুষ। *জিমেইল* ব্যবহারকারী ৪২৫ মিলিয়ন। অন্যদিকে *ইয়াহু মেইল* ব্যবহার করে ২৮১ মিলিয়ন ইউজার। *আউটলুকের* ব্যবহারকারী ৬০ মিলিয়ন। *নিম্বাজের* ইউজার ১৫০ মিলিয়ন। *লিঙ্কডইন* ব্যবহার করে ২০০ মিলিয়ন (-এই পরিসংখ্যানগুলো ২০১৩ সালের)। শতকরা ৮৯% গ্রাহক তাদের সঠিক নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে এসব নেটওয়ার্কের সদস্য হয় এবং এভাবে এই মিডিয়াগুলো গুপ্তচরবৃত্তিরও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

এই সময়ের পৃথিবীতে মাত্র ছয়টি মিডিয়াজায়ান্ট বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এগুলো হলো- ডিজনি, নিউজ করপ, বার্টেলসম্যান, ভায়াকম, ভিভেন্দি-ইউনিভার্সাল, এওএল-টাইমওয়ার্নার। এই মিডিয়া-বিশ্বের সমন্বিতরূপকে বলা

হচ্ছে- *'A Small World of Big Conglomerates'*। টাইমওয়ার্নারের ১৯৯৭ সালে মোট বিক্রির পরিমাণ ছিল ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৮৯ সালে টাইম ও ওয়ার্নার কমিউনিকেশনস্ মিলে গড়ে তোলে টাইমওয়ার্নার। টাইমওয়ার্নারের সঙ্গে আমেরিকান অনলাইনের (AOL) সংযুক্তি ঘটে ২০০০ সালে। *এওএল* আমেরিকার বৃহত্তম ইন্টারনেট প্রভাইডার। ইউরোপেও এর বিরাট বাজার আছে। ফ্রান্সের মিডিয়া-কোম্পানি ভিভেন্দি কিনে নিয়েছে আমেরিকান ইউনিভার্সালকে। ২০০৭ সালে থমসন কিনে নিয়েছে রয়টার্সকে, গুগল কিনেছে ডবল ক্লিক, ইয়াহু কিনেছে রাইটমিডিয়া। অন্যভাবে বলতে গেলে, বড়ো মিডিয়ার পেটে প্রায়শ হজম হয়ে যাচ্ছে ছোট বা মাঝারি মিডিয়াগুলো।

...

মধ্যপ্রাচ্য ও তৃতীয়বিশ্বের দেশগুলোতে গণমাধ্যমের সংবাদ বিকৃতি নিয়ে চিন্তক এডওয়ার্ড সাঈদ 'কভারিং ইসলাম' (Covering Islam How The Media & The Experts Determine) বইয়ে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। নিউইয়র্ক পোস্ট, নিউ রিপাবলিক, নিউইয়র্ক টাইমস, কমেন্টারি, দি আটলান্টিক, টাইম ম্যাগাজিনসহ নামীদামী পত্রিকার হোমরা-চোমরা সাংবাদিক ও *কলামিস্ট* যেমন- জন ফিকনার, মার্শাল হার্ডসন, ফ্রিৎস স্টার্ন, রবার্ট থুকার, দানিয়েল প্যাট্রিক, এন্থলি হার্ট ও ওয়ালজারের সংবাদ পর্যালোচনা করে সাঈদ বলছেন, 'ধর্মীয় কোন্দল ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর ক্ষেত্রে কিংবা রাজনৈতিক সংঘাত সৃষ্টিতে এসব মিডিয়া প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। প্রাচ্যে পশ্চিমের চারণভূমি তৈরির মিশন নিয়ে এদের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়।' সাঈদ দেখাচ্ছেন, তৃতীয়বিশ্বের বাসিন্দাদের উপর কিভাবে ছড়ি ঘোরাচ্ছে গুটিকয় পশ্চিমা সংবাদসংস্থা। এসব সংস্থার কাজ, তৃতীয়বিশ্বে সংবাদ স্থানান্তর করা যেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংবাদগুলো তৃতীয়বিশ্বেরই কোনো অঞ্চল সম্পর্কিত। এর অর্থ, এই দেশগুলো খবরের উৎস হওয়ার পরিবর্তে পরিণত হয়েছে 'সংবাদভোক্তায়'। তারা নিজেদের ব্যাপারগুলো দেখছে *সিএনএন-বিবিসির* চোখে। নিজেদেরকে মূল্যায়িত করছে এসব কর্পোরেশনের তৈরি স্ট্যান্ড ও তাদের সরবরাহকৃত তথ্যের আলোকে।

নৃ-বিজ্ঞানী তালাল আঙুল উঠাচ্ছেন 'নয়া-উদারনৈতিকতাবাদের' অন্তরালে দেশে দেশে ছড়িয়ে দেওয়া সংঘাতের দিকে। এসব চলছে যুদ্ধ, হামলা, গুপ্তহত্যা ও ইসরঈল-আমেরিকার নিরাপত্তার স্বার্থে নিরীহ গ্রামবাসী হত্যাসহ নানা নামে। নিরাপত্তার অজুহাতে নানান প্রযুক্তি আমাদের চারদিক ঘিরে ধরেছে। কোনো কিছুই গোপন নেই। ক্যামেরা আপনার চারদিকে ঘুরঘুর করছে। *জাতীয় পরিচয়পত্রসহ* বিবিধ আইডির অন্তর্জালে আপনাকে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। অদৃশ্য বিমান প্রহরা, স্যাটেলাইট থেকে প্রতিমুহূর্তে চালানো গোপন নজরদারি- যেকোনো মুহূর্তে একজন বিপজ্জনক সন্ত্রাসীরূপে সন্দেহের শিকার হওয়া বা অভিযুক্ত করা এখন সময়ের ব্যাপার। *তালাল* দেখাচ্ছেন, 'সেটি আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তান কিংবা আফ্রিকার বিষয়ই নেই। আপনি দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকুন, ঘরে-বাইরে নিরাপত্তার মহাকারবার'।

...

সন্দেহ নেই, ইসলামের শত্রুদের হাতে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের উপায়-উপকরণ অনেক অনেক বেশি। কিন্তু মুসলমানদের ঈমানি শক্তির মোকাবেলা করবার মতো অস্ত্র তৈরিতে তারা কখনো সমর্থ নয়। পশ্চিমাদের অব্যাহত মিথ্যাচার সত্ত্বেও ইসলামের প্রতি গণমানুষের আগ্রহ ও প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে এই বন্ধন ছিন্ন করা একেবারেই অসম্ভব। সন্ত্রাসবাদের জিগির তোলা অনবরত পশ্চিমা মিথ্যাচারের বিপরীতে উম্মাহর পুনর্জাগরণ, কুফুরির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জেগে উঠা গণপ্রতিরোধ, উপমহাদেশসহ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও আরববিশ্বের সাম্প্রতিক জাগরণ এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

নোট : সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত স্ট্যাটিস্টিকগুলো ২০১৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের। এরপর জল বহুদূর গড়িয়েছে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফেসবুকের বর্তমান ইউজার : ২.৬৭ বিলিয়ন। বাংলাদেশে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ফেসবুক ইউজার : ২ কোটি ৮০ লাখ। সোর্স : internetworldstats.com

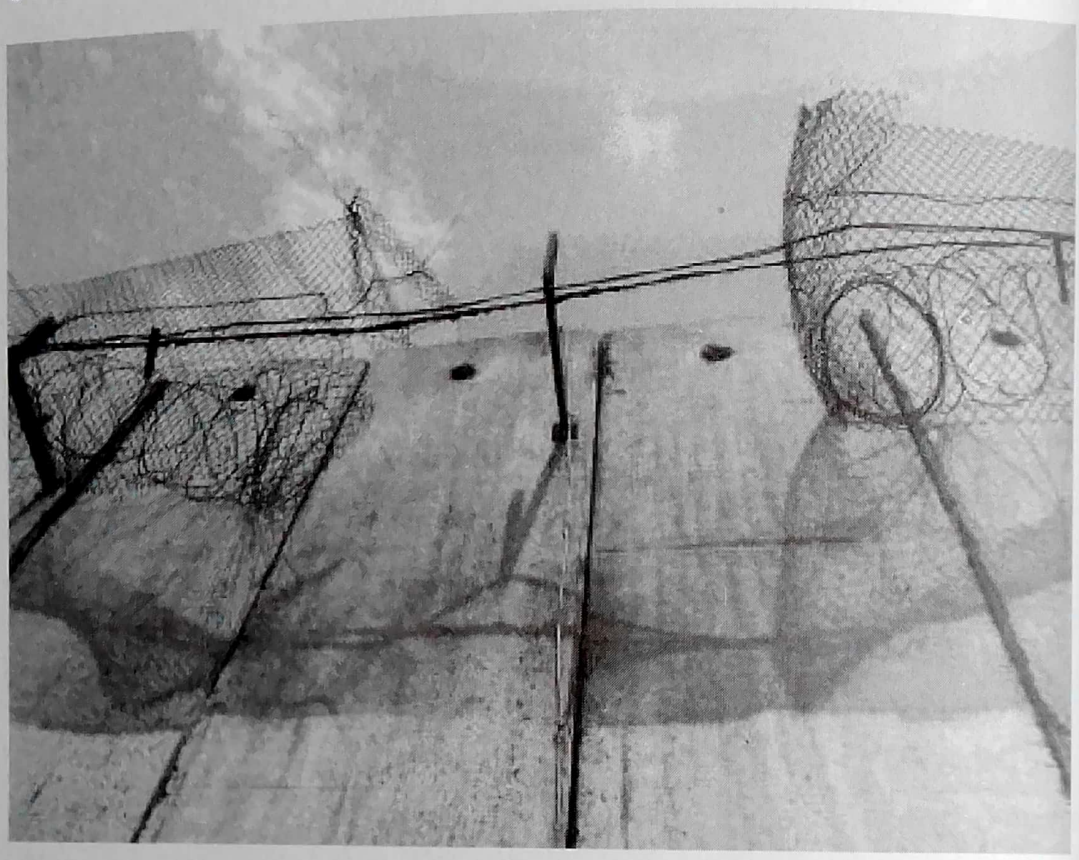
দখলদারির দেয়াল...

(প্রসঙ্গ : *সাংস্কৃতিক বয়কট*)

'অ্যানাদার ব্রিক ইন দ্য ওয়াল' –জগতখ্যাত এই গানের রচয়িতা রজার ওয়াটার্স ২০০৫ সালে তেলআবিবে কনসার্ট করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য ও বৈধ অধিকারের প্রতি সংহতি জানান। ইসরঈলি আগ্রাসন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বয়কটের প্রস্তাবানা রেখেছেন এই গায়কি। এই নিবন্ধে ওয়াটার্সের কিছু ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৮০ সালে একটি গান লিখি, 'অ্যানাদার ব্রিক ইন দ্য ওয়াল পার্ট-২'। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এই গানটি নিষিদ্ধ করে। সে দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা সমঅধিকারের কথা তুলতে গানটি ব্যবহার করতো বলে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তখনকার বর্ণবাদী সরকার বেশকিছু গানের ওপর একধরনের সাংস্কৃতিক অবরোধ আরোপ করে। ২৫ বছর পর ২০০৫ সালে ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরে এক উৎসবে যোগ দেওয়া ফিলিস্তিনি শিশুরা পশ্চিমতীরকে ঘিরে ইসরঈলের দেয়াল তোলার প্রতিবাদ জানাতে সেই গানটিই ব্যবহার করে। তারা গায়, 'উই ডোন্ট নিড নো অকুপেশন! উই ডোন্ট নিড নো রেসিস্ট ওয়াল!' আমি তখনো স্বচক্ষে দেখিনি, গানে তারা কিসের কথা বলতে চাইছে? পরের বছর তেলআবিবে গান পরিবেশন করার ব্যাপারে আমার সঙ্গে চুক্তি হয়। চুক্তিটি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান কিছু ফিলিস্তিনি। তারা ইসরঈলকে শিক্ষায়তনিক ও সাংস্কৃতিক বয়কটের আন্দোলনে সক্রিয়। দেয়ালের বিরুদ্ধে আমি আগেই জোরালো অবস্থান নিয়েছিলাম। কিন্তু সাংস্কৃতিক বয়কটের পথ ঠিক কিনা, তা

নিয়ে তখনো আমি দ্বিধাগ্রস্ত। বয়কটের পক্ষের ফিলিস্তিনিরা আমার কাছে আহ্বান জানালেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্বচক্ষে 'দেয়াল' দেখতে আমি যেন পশ্চিমতীর যাই। রাজি হলাম।



জাতিসংঘের নিরাপত্তাধীনে জেরুসালেম ও বেথলেহেম সফর করলাম। সেদিন যা দেখলাম, তার জন্য কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না। দেয়ালটি দেখতে মর্মান্তিক। ইসরঈলি তরুণ সেনারা দেয়ালের পাহারায়। তারা আমাকে বাইর থেকে আসা নৈমিত্তিক কোনো দর্শক ভেবেছে। আমার প্রতি তাদের আচরণ ছিল ঘৃণাপূর্ণ ও আগ্রাসী। আমি বিদেশি, দর্শক। আমার প্রতি যদি এমন আচরণ হয়, তাহলে একবার ভাবুন, কেমন আচরণ করা হয় ফিলিস্তিনিদের প্রতি, নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতি কিংবা পাসবুক বহনকারীদের প্রতি? তখন বুঝলাম, সেই দেয়াল থেকে, আমার দেখা সেই ফিলিস্তিনিদের ভাগ্য থেকে আমাকে পালিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে দেবে না আমার বিবেক। আমার দেখা সেই ফিলিস্তিনিদের জীবন নিত্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে ইসরঈলি দখলদারিত্বে। তাদের

প্রতি সংহতি জানিয়ে (কিছুটা অক্ষমতা থেকেও) সেদিন আমি দেয়ালে লিখলাম, 'উই ডোন্ট নিড নো থট কন্ট্রোল'। সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম, তেলআবিবের মঞ্চে আমার উপস্থিতি ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে আমার দেখা নিপীড়নকেই বৈধতা দেবে। তাই তেলআবিব স্টেডিয়ামে গান পরিবেশনের চুক্তি বাতিল করে সরিয়ে নিলাম 'নেবে শালমে'[১]। এখানকার বাসিন্দারা কৃষিজীবী। মটরদানার চাষ ও বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে নিবেদিত। এখানে আরব, খৃস্টান ও ইহূদিরা পাশাপাশি সম্প্রীতির বন্ধনে বসবাস করে।

সব প্রত্যাশা ছাড়িয়ে সংগীত আসরটি হয়ে উঠে ইসরঈলের ইতিহাসে সবচে বড়ো আয়োজন। যানজটের সঙ্গে লড়ে শেষ অবধি ৬০ হাজার ভক্ত জমায়েত হয়। আসর শেষে সমবেত তরুণদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করি, তারা প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং ইসরঈলে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের নাগরিক অধিকারকে শ্রদ্ধা করতে সরকারের প্রতি যেন দাবি জানায়।

ইসরঈলি আরব ও ইহূদিদের সমান অধিকার দিয়ে প্রণীত আইন বাস্তবায়নে ইসরঈল সরকারের কোনো ইচ্ছাই নেই। দেয়ালই শুধু বাড়ছে। অবৈধভাবে পশ্চিমতীর দখলও অব্যাহত আছে। গাজার জনগণ কার্যত ইসরঈলের এই আগ্রাসী অবরোধের দেয়ালে বন্দী। তাদের কাছে দেয়ালের মানে, গুচ্ছ গুচ্ছ অন্যায়ের বোঝা। দেয়াল মানে, ক্ষুধার্ত পেটে শিশুদের ঘুমোতে যাওয়া; ও চরম পুষ্টিহীন বহু শিশু। দেয়াল মানে, বিধ্বস্ত অর্থনীতি; মা-বাবার কাজ না জোটা, পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে না পারা। দেয়াল মানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র বৃত্তি নিয়ে বিদেশে পড়তে যাচ্ছে, তার আজীবনের তরে চলে যাওয়ার সুযোগ-সন্ধান। কেননা, তাদের আসা-যাওয়ার অনুমতি নেই।

বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো যেহেতু একতরফা ও নির্লজ্জভাবে ইসরঈলি আগ্রাসনকে বৈধতা দিয়ে যাচ্ছে, তাই জনগণকেই সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে;

---

১ নেবে শালমে-শান্তির মরুদ্যান। ইসরঈলি আরব ও ইসরঈলি ইহূদিদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেষ্টায় গড়ে তোলা সম্প্রীতির গ্রাম।

তাদের হাতে যে হাতিয়ারই থাকুক না কেন, তা নিয়েই প্রতিরোধ করতে হবে। এর অর্থ, ইসরঈলের বিরুদ্ধে বয়কট, ডাইভেস্টমেন্ট অ্যান্ড স্যাংকশনস (বর্জন, বিনিয়োগ-প্রত্যাহার ও নিষেধাজ্ঞা) প্রচারণায় যোগ দেওয়ার মাধ্যমে সংহতি জানিয়ে পাশে দাঁড়ানোর অভিপ্রায় ঘোষণা। মৌলিক মানবাধিকার সবারই প্রাপ্য, এই ভাবনা থেকে আমার এই প্রত্যয়। আমার সহকর্মী ও অন্যান্য শিল্পের শিল্পীদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা এই সাংস্কৃতিক বয়কটে শরিক হোন। যতোদিন দখলদারির দেয়ালের পতন না ঘটবে, যতোদিন ফিলিস্তিনিরা শান্তিতে বাস করতে না পারবে, স্বাধীনতা ও তাদের প্রাপ্য ন্যায় ও মর্যাদা সহকারে, ততোদিন ইসরঈলে কোনো অনুষ্ঠান করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আমরাও ন্যায্য কাজই করবো। নতুন সেই দিন আসবে, নিশ্চয়ই।

CamScanner

‘মানবিক হস্তক্ষেপের’ ছলাকলা

আমেরিকা দখল করার কারণ হিসেবে ইউরোপিয় দখলদারেরা বলেছিল, তারা আসলে সেখানকার আদিম মানুষকে পাপের পথ থেকে রক্ষা করছে। আফ্রিকায় তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছে কালো মানুষকে সভ্য করার কথা বলে। আজকের দুনিয়াতেও একই কাজ চলে আসছে। ক্ষমতাবানেরা বলে পেছনের দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে তাকাতে। কিন্তু দুর্বলের জন্য এটি বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়।...

আজকের দুনিয়ায় যখনই ‘হিউম্যানেটারিয়ান ইন্টারভেনশন’-‘মানবিক হস্তক্ষেপে’র আলোচনা আসে, তখনই বাক্সবন্দী ইতিহাসের কঙ্কাল খটাখট নড়ে ওঠে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানবিকতার নামে সংঘটিত অজস্র বিব্রতকর মানবতাবিরোধী ঘটনার কথা। ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্কের’ ইতিহাসজুড়ে অল্পকয়েকটি নীতি সর্বত্র পালিত হয়ে আসছে। গ্রিক ঐতিহাসিক থুসিডাইডেসের প্রবচনটি উল্লেখযোগ্য, ‘শক্তিমান যা ইচ্ছা তাই করে, দুর্বলেরা ভোগে অপরের ইচ্ছায়’। আয়ান ব্রাউনলিও এরকমই বলেছেন, ‘শক্তিমানের ইচ্ছাই আইন’। বৃটেনে একসময় সব নীতি ঠিক করা হতো ব্যবসায়ী ও শিল্পমালিকদের স্বার্থে, যদিও তার পরিণতি ভোগ করতো সাধারণ মানুষ এবং দখলাধীন ভারতবর্ষকে। ‘রক্ষার দায়িত্বের’ কথা বলেই জাপান *মাঞ্চুরিয়া* দখল করে নিয়েছিল, হিটলার আগ্রাসন চালিয়েছিলেন চেকোস্লাভাকিয়ায়, মুসোলিনি দখল করেন ইথিওপিয়া। অবশ্য এদের প্রত্যেকেই তাদের অপকর্মের পক্ষে যুক্তি ও ‘মানবিক’ অজুহাত খাড়া করেছিলেন। এ সময়েও কোনো পরিবর্তন ছাড়াই এই ধারাবাহিকতা বহাল রয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এটিই চলতি নিয়ম।

আমেরিকা দখল করার কারণ হিসেবে ইউরোপিয় দখলদারেরা বলেছিল, তারা আসলে সেখানকার আদিম মানুষকে পাপের পথ থেকে রক্ষা করছে। আফ্রিকায় তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছে কালো মানুষকে 'সভ্য' করার কথা বলে। আজকের দুনিয়াতেও একই কাজ চলে আসছে। ক্ষমতাবানেরা বলে পেছনের দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে তাকাতে। কিন্তু দুর্বলের জন্য এটি বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়।

আজ থেকে ৬০ বছর আগে আন্তর্জাতিক আদালত সিদ্ধান্ত দেয়, 'অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, হস্তক্ষেপের অধিকার কেবল শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর জন্যই সংরক্ষিত এবং এটি সহজেই আইনের শাসনকে নষ্ট করে ফেলে।' ২০০০ সালে ১৩৩টি দেশের উপস্থিতিতে সাউথ সামিটে একই কথা উচ্চারিত হয়। এই সম্মেলনের ঘোষণায় সার্বিয়ায় ন্যাটোর বোমাবর্ষণকে জাতিসংঘ সনদের লঙ্ঘন বলে ঘোষণা করা হয়। ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকা ও আরববিশ্বের চিরাচরিত নিপীড়িত রাষ্ট্রগুলো এধরনের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে। দেখা যায়, এধরনের হস্তক্ষেপের অধিকার কেবল ন্যাটোরই রয়েছে, ল্যাতিন আমেরিকার জোট ওএএস বা আফ্রিকান ইউনিয়নের সেই অধিকার নেই। একদিকে বলকান দেশগুলো, অন্যদিকে আফগানিস্তান-পাকিস্তানের ওপর ন্যাটো তার মর্জিমতো এখতিয়ার ঘোষণা করেছে। 'মানবাধিকার' কিংবা স্থানীয় মানুষকে রক্ষায় (!) তারা এসব অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, কিন্তু এই দেশগুলো ন্যাটোর সদস্য নয়। বাস্তবে এই ন্যাটোই তার সদস্যদেশগুলোর গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনকে চরম আশকারা দেয়। তুরস্ক ১৯৯০ সাল থেকে সেখানকার কুর্দিদের ওপর চরম নিপীড়ন চালালেও ক্লিনটন প্রশাসন তুরস্ককে সাহায্য-সহযোগিতা করে যায়। এর বাইরে পাশ্চাত্যগামী যেকোনো তেলের পাইপলাইন বা সমুদ্রপথে কোনো বাধা সৃষ্টি হলে সেসব স্থানেও হস্তক্ষেপের একচেটিয়া ক্ষমতা তারাই সংরক্ষণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোও তাদের ক্ষমতার ছায়ার নিচে।

ইরাকে মানবতার ধ্বংস তাদের বিচলিত করে না। নিরাপত্তা পরিষদের অবরোধে ইরাকে লাখ লাখ শিশু মারা যায়। কঙ্গোতে কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধায়

ধুঁকছে। জাতিসংঘের তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির দুই পরিচালক ইরাকে অন্যায় অবরোধের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। তাঁরা একে মানবতাবিরোধী ও 'গণহত্যা' বলে আখ্যায়িত করেন। অথচ আমেরিকা ও বৃটেন নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তে 'মানবতা'কে রক্ষার কথা বলে দেশটিতে আগ্রাসন চালায়। একইভাবে গাজার জনসাধারণকে রক্ষার কোনো চিন্তা এদের মধ্যে দেখা যায় না। অথচ এটিও জাতিসংঘের দায়িত্ব। জাতিসংঘের দায়িত্ব, জেনেভা কনভেনশন দ্বারা রক্ষিত অন্যান্য জনসাধারণকে রক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়া। যেমন বিবিসির প্রতিবেদন অনুসারে, পূর্ব কঙ্গোতে বহুজাতিক কম্পানিগুলো জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে মূল্যবান খনিজ সম্পদের বেআইনি ব্যবসা চালাচ্ছে এবং সেই ব্যবসা নিরাপদ রাখতে ভয়ঙ্করতম সংঘাত জিইয়ে রাখায় তহবিলও জোগান দিচ্ছে।

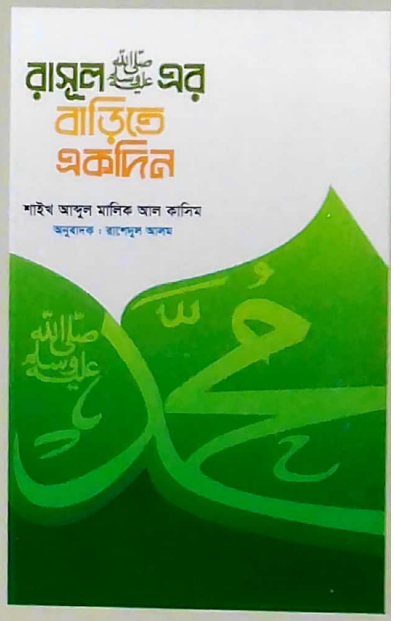
জাতিসংঘ সম্প্রতি দরিদ্র দেশগুলোর ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা শত কোটি ছাপিয়ে গেছে বলে ঘোষণা করেছে। এদের রক্ষায় কোনো মানবিক হস্তক্ষেপের চিন্তা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রশক্তির কল্পনাতেও আসে না। পাশাপাশি জাতিসংঘ বৈশ্বিক খাদ্য কর্মসূচির তহবিল কমিয়ে আনে। কারণ ধনী দেশগুলো এ খাতে চাঁদা কমিয়ে দিয়েছে। মন্দায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের চেয়ে তারা আর্থিক বিপর্যয়ের জন্য দোষী ব্যাংকগুলোকেই বিরাট তহবিল দিচ্ছে। কয়েক বছর আগের হিসেবে দৈনিক ১৬ হাজার শিশু ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে। সামান্য রোগেই মরে যাচ্ছে আরো অনেকে। এই মৃত্যু ঠেকানো যদিও সহজ, কিন্তু সেদিকে কারো মনোযোগ নেই।

'মানবিক হস্তক্ষেপের' সবচেয়ে ঘৃণ্য উদাহরণ ইরাক। সঙ্গে আছে 'ভেটোর' প্রয়োগ। গত ২৫ বছরে আমেরিকা ৪৩, রাশিয়া ৪, যুক্তরাজ্য ১০ এবং চিন ও ফ্রান্স ৩টি 'ভেটো' দিয়েছে। বিশ্বশান্তির স্বার্থে এই ভেটো ক্ষমতা রদ হওয়া উচিত। এসব কারণে, বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অপ্রাসঙ্গিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো এগুলো মানতে নারাজ। বৈশ্বিক বিপ্লবই পারে এসব অমানবিকতাকে রুখতে।

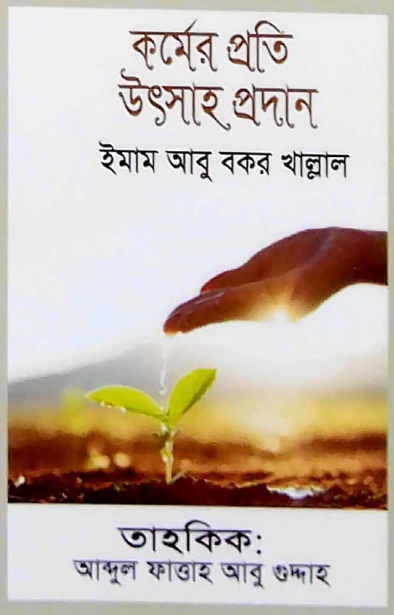
(২৩ জুলাই ২০০৯ সালে মার্কিন বুদ্ধিজীবী ও ভাষাতাত্ত্বিক নোয়াম চমস্কির জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দেওয়া বক্তব্যের ছায়াবলম্বনে সংক্ষেপিত)

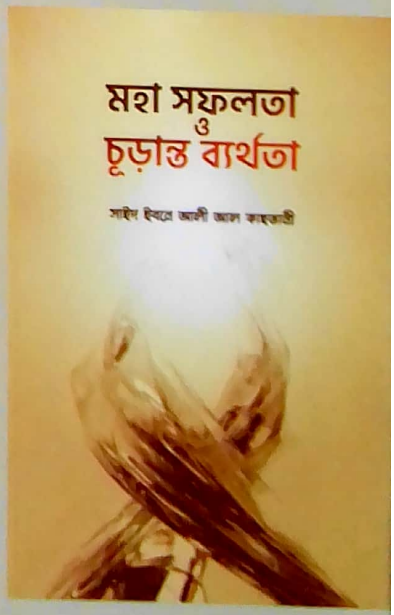
উদ্দীপন প্রকাশন থেকে প্রকাশিত সাড়াজাগানো দুটি বই





উদ্দীপন প্রকাশন থেকে প্রকাশিতব্য দুটি বই





শ্বেত সন্ত্রাসের (White Aggression) প্রায় শত বছর হতে চলেছে। খেলাফত পতনের পর থেকে মুসলিম কোনো ভূখণ্ড নিরাপদে নেই। মরক্কো থেকে ফিলিপিন, কোথাও মুসলিমেরা শান্তিতে নেই। পশ্চিমা সন্ত্রাসীদের নির্যাতন-নিপীড়ন এখন সর্বোচ্চ চূড়ায় এসে উপনীত হয়েছে। এই একবিংশ শতাব্দীতে 'ওয়ার অন টেরর'-নামে কুফফার শক্তি চূড়ান্ত ক্রুসেডের ডাক দিয়েছে। আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, ইয়েমেন, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, মিসর, আলজেরিয়া, কাশ্মির, ফিলিস্তিন, সিরিয়া -সর্বত্র আগুন জ্বলছে। পূর্বের তরবারি ও ঢালের স্থান নিয়েছে ক্লাশিনকোভ, ফাইটার প্লেন, ট্যাঙ্ক, ড্রোন। কিন্তু আরো মারাত্মক কিছু যুক্ত হয়েছে এখন। যুদ্ধ শুধু ময়দানে সীমাবদ্ধ নেই। তা ময়দান থেকে এখন প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। একে বলে, সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার বা 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ'। যোগ হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কটের হাতিয়ারও। এছাড়া পশ্চিমের পক্ষে আছে আলখেল্লাধারী মোন-াফেকরাও। শেষ বারো বছরে আমরা অনেক নতুন কিছু অবলোকন করেছি। আরব বসন্ত, আফগানিস্তানে আমেরিকার পরাজয়, ওসামা বিন লাদেনের হত্যা, সিরিয়ায় মহাযুদ্ধের পদধ্বনি, গাদ্দাফি, সাদ্দাম, হোসেনি মোবারকের পতন, মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা। দেখেছি সিরিয়ার শরণার্থী, আয়লান কুর্দি ও বাকসোবন্দী মানবতার দৃশ্য, দেখেছি গণবিপ্লব ও তথাকথিত গণতন্ত্রের উত্থান, দেখেছি বস্তুবাদের কাছে মানবতার মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা, দেখেছি ভারতে হিন্দুত্ববাদের উত্থান ও মিসরে নবনির্বাচিত মুরসির পতন। দেখেছি সিরিয়া হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আফগানিস্তান, আর গাজায় দখলদারির দেয়াল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, এই সময় পতনের নয়, এটি উত্থানের সময়। নিপীড়িত মুসলিমেরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রস্তুতি নিচ্ছে মহাযুদ্ধের কালের। আমেরিকার সিক্রেট মিশন ব্যর্থ হচ্ছে। পশ্চিমা সভ্যতার আর্তনাদ আকাশে-বাতাসে গুঞ্জরিত হচ্ছে। আর বেশি দিন নেই। বেশি দেরি নেই। ইনশাআ-ল্লাহ, আমরা এই জায়ান্ট সিভিলাইজেশনকে (দানবীয় সভ্যতা) ধ্বংস হতে দেখতে পাবো। চূড়ান্ত বিজয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

নির্বাচিত ও পরিমার্জিত প্রবন্ধ সংকলন

শ্বেত সন্ত্রাসের এই সময়

সাঈদ মুহাম্মাদ আবরার

CamScanner